তৃতীয় অধ্যায়

জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে— "God made the village, man made the town" অর্থাৎ বিধাতা গ্রাম সৃষ্টি করেছে আর মানুষ তৈরি করেছে নগর বা শহর। গ্রামীণ জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতির স্নিগ্ধ সবুজ, প্রশান্তির ছায়া, কাকডাকা ভোর কিংবা টিনের চালে রিঝঝিম বৃষ্টির শব্দ প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের সংস্পর্শেই পাওয়া যায়। গ্রামের সারি সারি গাছপালা, আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, ফসলের ক্ষেত, বসতবাড়ি, পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরার দৃশ্য— সবকিছু যেন ছবির মতো। গ্রামাঞ্চলের সাথে বাঙালীর নাড়ির সম্পর্ক। পলাশরাঙ্গা, কোকিলডাকা আর ধানের খেতের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঢেউখেলার মতো দৃশ্য গ্রাম বাংলার এক চির পরিচিত রূপ। অন্যদিকে নান্দনিক স্থাপত্য, আকাশচুম্বি সব অট্টালিকা শহরকে একদিকে যেমন করে তুলেছে দৃষ্টিনন্দন, অন্যদিকে তার বুকে বাস করা মানুষগুলির কর্মব্যস্ততার আড়ালে মানুষের সাথে মানুষের ঠুনকো সম্পর্ক, মানুষের মনের আবেগ-ভালোবাসা-আন্তরিকতা ক্রমেই যেন অনুভূতিহীনতার দিকে এগোচ্ছে। সাহিত্য যেহেতু মানুষকে নিয়ে এবং মানুষের জন্য তাই সাহিত্য গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন— দুই জীবনকে নিয়েই জীবন জিজ্ঞাসা অন্বেষণ করে।

ষাটের দশকে গল্প লিখতে আরম্ভ করা জীবন সরকারের গল্পে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন কিভাবে বর্ণিত হল তা জানতে হলে বিশ শতকের কিছু ঘটনাকে তুলে ধরতে হবে। আসলে বিশ শতক নিজেই একটা যেন ইতিহাসের ভূমিকাপত্র। বিশ শতকের সূচনাকালে বিশাল কোনো প্রত্যাশা নিয়ে বাঙালী নতুন শতাব্দীকে বরণ করে নিয়েছিল কিনা, নাকি আগের শতকের জন্য হা-হুতাশ করেছিল তা আমরা জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসাপূর্ণ হয়ে অন্বেষণ করার ইচ্ছা হয়, বিশ শতকের একশটা বছর বাঙালী জীবনে কোন বার্তা বহন করে এনেছিল। জীবনে চলার পথে এই শতাব্দীতে বাঙালীর প্রাপ্তির ঘরে কি কি যোগ হল, আর বাঙালী জীবন থেকে কি কি হারিয়ে গেল। বাঙালীর সংস্কৃতি কি একশ বছর ধরে একমুখী সরলরেখায় এগিয়ে চললো, না কী নানা বাঁকে ফিরতে ফিরতে নতুন কোনো পথের সন্ধান পেল।

আসলে স্বাধীনতার আগে বাঙালীর জীবন যেভাবে কেটেছে, স্বাধীনতার পর সেভাবে কাটেনি। স্বাধীনতার আগে বিশ শতকের সূচনায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালী সমাজের একটা বিরাট অংশ হয়েছিল উচ্চবিত্ত। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই কালেই বাঙালীমনে

দানা বেঁধেছিল। দেশকে মুক্ত করতে ফাঁসির মঞ্চে আত্মহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল একের পর এক বাঙালী তরুণ, সহ্য করেছেন অপরিসীম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। এরই মাঝে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার ঢেউ বাঙালী মনে আছড়ে পড়েছিল। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে বাঙালী তরুণদের কেউ কেউ শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত এক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। নিজের অধিকার আদায় করে নেবার জন্য সংগ্রামে নেমেছিল বাংলার কৃষক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙালী জীবনকে তেমনভাবে স্পর্শ না করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের তাপে ঝলসে গেল বাঙালীর জীবন। এর সঙ্গে শুরু হল দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তর। আর এর মাঝেই মুক্ত হল দেশ ইংরেজদের কবল থেকে। এই স্বাধীনতা বাঙালীর জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হিসাবে দেখা দিল। ধর্মের সুড়সুড়িতে বাঙালী জাতির ভূখণ্ড দ্বি-খণ্ডিত হল। বাঙালীর ইতিহাসে এতবড় বিপর্যয় আর কখনো আসেনি। দেশভাগের মূল্য দিতে হল বাঙালী সমাজকে। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ছিন্নমূল নারী পুরুষের চোখের জলে বাংলার মাটি ভিজে গেল। অভূতপূর্ব এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল বাংলার গ্রামজীবন— শহরজীবন। অর্থনীতির মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মূল্যবোধের ভাঙ্গন, রাজনীতির দিহাশীনতা বাঙালী জীবনকে করে তুলল ভারাক্রান্ত। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল বাঙালী জীবন। শুধু নাগরিক জীবন নয়— পাল্টে গিয়েছিল গ্রামজীবনও। জীবন সরকারের গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবনের চিত্র উন্মোচনকারি গল্পগুলিতে রয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালীর আত্মকান্নার পাঁচালি। দারিদ্র, হতাশা আর ছেড়ে আসা দেশের বর্ণনার নস্টালজিয়া।

জীবন সরকারের গল্পে গ্রামজীবন:

গ্রাম বসতি মাত্র নয়। গ্রাম আদপে একটি সমাজ। ছোট বা বড় যে আকারেই হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গ সমাজকে ধারণ করে। 'Indian Village' শীর্ষক ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্ববিভাগ নির্দেশিত গবেষণা প্রকল্পে ড. সি. এস. দুবে ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে যা বলেছেন, তা হল—

> "As a territorial, as well as social, economic and ritual unit, the village is a separate and district entity. The residents of this settlement recognize their corporate identity, and it is recognized as such by others. It is not uncommon to find in them a sentiment of attachment towards their own settlement site. In several matters the villege acts as a unit."[১]

বুৎপত্তিগত দিক থেকে গ্রাম শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলেও পাওয়া যায় গ্রাস+ম (মন-অধিকরণে এবং অগ > √ম্ + অ(গঙ্)— কর্মবাক্যে। 'উপাদিসূত্র' অনুসারে গ্রাম শব্দের মূলে রয়েছে 'গ্রাস' ক্রিয়া। অন্যদিকে বৌদ্ধ যুগে রচিত 'অমরকোষ' অনুসারে গ্রাম শব্দ এসেছে 'গম' ক্রিয়া থেকে। 'উপাদিসূত্রে' গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা অমরকোষের সময়ে সেই গ্রামের চেহারা বদলে যায়। কারণ যেহেতু দুটি গ্রন্থের মধ্যে রচনাকালের ব্যবধান অনেক, সে কারণেই সমাজ বাস্তবতা দুই ক্ষেত্রে অনেকটাই আলাদা। ঋগ্বেদও গ্রাম শব্দটি পাওয়া যায়। সেখানে গ্রাম শব্দের অর্থ 'সমূহ'। সমূহের আবাসস্থল বলতে গ্রাম বোঝায়। সাধারণভাবে শহর থেকে পৃথক; মূলত কৃষিনির্ভর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ লোকলয়ই গ্রাম নামে পরিচিত। চিন্ময়ী ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> ''গ্রাম' শব্দটি বেদে পাওয়া যায়। সেখানে গ্রাম শব্দের অর্থ 'সমূহ'। সমূহের আবাসস্থল বলতে গ্রাম বোঝায়। সাধারণভাবে শহর থেকে পৃথক; মূলতঃ কৃষিনির্ভর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত নাতিবৃহৎ লোকালয়ই গ্রাম। ... দুশো তিনশ বছর আগের অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা গ্রাম শব্দের বিকৃতি পাই। সে সাহিত্যে গ্রাম সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। যদি কেউ মূর্খ হতে চাও তবে তিনদিন গ্রামে বাস করবে। অথবা লব্ধ জ্ঞান ভুলে যাবে যদি কিছুদিন গ্রামে বাস কর। মঙ্গলকাব্যগুলিতে গ্রাম সম্বন্ধে ঠিক এরকম অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়নি সত্য, কিন্তু আমরা কবিকঙ্কন মুকুন্দের কাব্যে গ্রাম ও নগরের একটি পার্থক্য মোটামুটিভাবে পেয়ে যাই। সফিসটিকেটেড্ বলতে যা বোঝায় মুকুন্দ নগর সম্পর্কে এরকমই ধারণা দিয়েছেন।''[২]

মহেঞ্জোদাড়োর মতো নগর কেন্দ্রিক আদিম যৌথ সভ্যতা ভেঙ্গে পড়বার পর যৌথ সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট দলে বিন্যস্ত হয়ে যায়। সেই ছোট ছোট দল এক একটি এলাকায় বাস করতে শুরু করে। তাদের বসবাসের স্থান গ্রাম নামে পরিচিত হয়। এই গ্রামের মানুষেরা তাদের পরিচালক— মহিতী বা পুরোহিতের নেতৃত্বে যা কিছু উপাদান ও আহার্য্য সংগ্রহ করত তার সবটাই ভোগ করে নিত। বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসারে গ্রাম হল সেই স্থান, যেখানে সবাই মিলে একসাথে ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করে থাকে। একেবারে প্রথম যুগের গ্রাম বা আদি গ্রাম বলতে ঠিক এই রকমটাই বোঝাত।

বিভিন্ন বাংলা অভিধানে সাধারণত গ্রাম শব্দটির যে সকল অর্থ পাওয়া যায় সেগুলি হল— পল্লী, পাড়াগাঁ, লোকালয় বা ক্ষুদ্র জন বসতি। ইংরাজি 'ভিলেজ' (Village) শব্দটির অর্থও প্রায়ই একই রকম—

"A village is a clustered human setllement or community, large than a hamlet with the population ranging from a few hundred to a few thousand (sometimes tens of thousands), though often located in rural area, the term urban village is also applied to certain urban neighourhoods, such as the East Village in Manhattan, New York City and the Saifi Village in Beirut, Lebanon, as well as Hampstead Village in the London Conurbation, Village are normally permanent, with fixed dwellings, however, transient villages can occur. Further, the dwellings of a village are fairly close to one another, not seattered broadly over the landscape, as a dispersed settlement."[৩]

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী গ্রাম নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন। তাদের গবেষণা সিদ্ধান্তে উঠে আসে, গ্রাম শব্দের ভিতরে ছিল গ্রস্ বা গ্রাস করার ব্যাপার। ছিল সীমিত সংখ্যক মানুষের একটি দল, ছিল একটি বিশেষ এলাকা এবং সর্বোপরি এদের মূল চরিত্র ছিল আত্মনির্ভরতা অর্থাৎ কিনা এই সীমিত সংখ্যক মানুষের দলটি নিজেতে নিজে পূর্ণ ছিল। বলা ভালো— 'পূর্ণ' গুণ সম্পন্ন ছিল। সেই কারণে গ্রাম শব্দটি ইংরেজি-বাংলা উভয়তেই গণনার একটি পরিমাপ রূপে প্রচলিত হতে পেরেছে। যথা— ঝাড়গ্রাম, কিলোগ্রাম ইত্যাদি। মানুষের জীবন প্রথমে ছিল শিকারজীবী যাযাবরের মতো। চাষবাস শেখার পরেই সে স্থির হয়ে বসতি স্থাপন করে। পশুপালন ও চাষবাস মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থানীয় বসতি স্থাপন করতে। এর ফলেই গ্রাম সভ্যতার পত্তন ঘটে। মানুষের ঘর সংসারের প্রথম রূপ হল গ্রাম। পরে নগর পত্তন হলে, বসতির আরেক রকম চেহারা দেখা যায়। কিন্তু গ্রামের নিজস্ব লক্ষণ হারায় না। কারণ মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে গ্রাম। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে তা প্রকাশ পেয়ে থাকে। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন, শহরকে নিয়ে মানুষ যতই গর্ব করুক না কেন, মানুষের আদি বসতির যে বিগ্রহরূপ মানুষের মনে চিরস্থায়ী রূপে আঁকা আছে, তা গ্রামই। যে শিশু গ্রাম দেখেনি, সে-ও ঘর আঁকে গ্রাম্য কুটিরের আদলেই। তার কল্পনার ঘর একটি দোচালা বা চারচালা কুঁড়েঘর, তার চারপাশে গাছপালা আছে, চাষের খেত আছে, ছবির একধারে আকাবাঁকা রেখায় সে টেনে দেয় একটি পুকুর বা নদীর সীমাও। গাছপালা, জমি-খেত, পুকুর-নদী, হাল-বলদ, চাষি-জেলে এই সব কিছু নিয়েই তো গ্রাম। এই অর্থকারক চিহ্নগুলির কোনো একটি বাদ দিয়ে আমরা যেন গ্রামকে কল্পনাই করতে পারি না। কৃষিনির্ভরতা ছিল গ্রাম

সমাজের মূল ভিত্তি। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়—

> ''অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসীক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সে প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ ভারত বহুদিন পর্যন্ত, কতাকাংশে হইলেও, এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিক-শক্তির সঙ্গে) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার সমস্ত পথই গিয়াছিল রুদ্ধ হইয়া; এবং তাহার ফলে বাংলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাঙলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সজ্ঞান, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে এবং কিছু দিনের জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ধরনের একটা চেষ্টা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুকাদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনও চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাঙলার ঐতিহাসিক কৃষিনির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাঙলাদেশকে একেবারে ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর গ্রাম্য সমাজে পরিণত করিয়া দিল।''[৪]

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ভাবনা অনুসারে একথা স্পষ্ট হয় যে, এই ভূমি ও কৃষি নির্ভরতা প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনকে একটা নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল। যা ছিল স্বনির্ভর এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বাঙালীর গ্রামজীবনে এসেছিল সর্বত্র পরিব্যপ্ত সুখ-শান্তি। আসলে আর্যাবত্য থেকে দক্ষিণাত্য পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম সমাজের গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। কৃষক ও কারিগরদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে ছিল এক একটা গ্রাম। তার সংলগ্ন চাষের জমি, গোচারণ ভূমি। কৃষকেরা জমি চাষ করে ফসল ফলায়। উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ রাজস্ব দেয়, কিছু দেয় গ্রামের কারিগরদের, বাকিটা নিজে ভোগ করে। জমি যতদিন কৃষক আবাদ করে, তার নির্দিষ্ট রাজস্ব দেয়— ততদিন জমি তার, পুরুষানুক্রমিকভাবেও সেই জমি ভোগ করতে বাধা নেই। গ্রামের

হাট বা সীমানার বাইরে যাওয়ার দরকার হত না। পথঘাট, যানবাহন তখন একরকম ছিলই না বলা চলে, তখন গ্রামের সঙ্গে গ্রামের, গ্রামের সঙ্গে নগরের যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হত না। খেয়ে পরে কাজ করেই গ্রামের মধ্যে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে, জীবনের দিনগুলো কেটে যেত। তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উদ্যম কোনোটারই মূল্য ছিল না মানুষের কাছে। তাই পরম নিশ্চিন্ত আমাদের গ্রাম্য সমাজ অচল অটল হিমালয়ের মতন সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা— বিক্ষোভ মাথা পেতে সহ্য করেছে।

হাজার হাজার বছর থেকে গ্রাম কেন্দ্রিক জীবনের যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তার বিরাম নেই আজও। কেবল আদি ভিত্তির ওপর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। মাঝে মাঝে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু কিছু নগর। তবে সেগুলির একটিও স্বনির্ভর হতে পারেনি। পুরোপুরি তারা গ্রাম নির্ভর। খাবারের প্রয়োজনে গ্রামের উপরেই নির্ভর করতে হয় নগরবাসীদের। তাই বলা যায়, নগরকে বাদ দিয়েই গ্রামগুলি চেষ্টা করলে কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকতে পারে কিন্তু গ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে নগর বেঁচে থাকতে পারে না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই গ্রাম বাংলার জীবনে কি কি পরিবর্তন এসেছিল, গ্রামজীবনে আগের মতো সন্ধ্যায় তুলসী তলার উলুধ্বনি পড়ে কিনা, নবান্নে পায়েসের সুঘ্রাণে মুখরিত হয় কিনা হেমন্তের আকাশ— জীবন সরকারের গ্রাম-বিষয়ক গল্পগুলি পড়লে সে চিত্র স্পষ্টভাবে উঠে আসে।

সভ্যতার আদি থেকেই সামাজিক মানুষ শুধুই দিন যাপনের সংগ্রাম ও হিসাবনিকাশ নিয়ে মেতে থাকলো না। বন্দী থাকল না কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজনের স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারের শ্বাসরুদ্ধ বন্দীশালায়। কেননা সে জানে—

> ‘‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
> আমি চোখ মেললুম আকাশে—
> জ্বলে উঠলো আলো
> পূবে-পশ্চিমে।
> গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’
> সুন্দর হল সে।’’[৫]

সমাজ সর্বদাই চলমান। মানুষের ক্রমগতিতে তার কোনো বিরাম নেই। এরই মধ্যে কত সুখ-আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, কত বিরহ-মিলনের স্বাগত-স্বগত প্রলাপ। কত পরাভূত জীবনের দীর্ঘশ্বাস আর গভীর-গভীরতর হাহাকার। কত আশা আর আশাভঙ্গের করুণ জটিল কথা। মনের

নিভৃতিতে সঞ্চিত কত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ চরম পরিণতি। মানুষকে নিয়েই সমাজ। সমাজ মানুষেরই জন্য। তাই দেশকালের কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের কত অভিজ্ঞতা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়েছে বা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সময় ও পরিস্থিতির দাবি মেনে সমাজ বদলায়। বদল আসে তার রীতিনীতি, ধরণধারণ, আদব কায়দায়। সাহিত্যের ভাবনা, বিষয় ও আঙ্গিকেও তাই যুগে যুগে ঘটে পরিবর্তন-রূপান্তর-বিবর্তন। সাহিত্যের মধ্যে বিবৃত হয় মানুষের চিরকালীন পরিচয়, যথার্থ পরিচিতি। যেকোনো গ্রামের মানুষেরই শহর সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যভরা কৌতূহল থাকে। শহর মানেই যেন বিরাট কিছু। শহর মানেই যেন সবকিছুতে পারদর্শী, স্মার্ট মানুষজন। জীবন সরকারের 'ভিনগাঁয়ের রাজপুত্তুর' গল্পে দেখি শহর থেকে একজন ছেলে আসবে শুনে গ্রামের মেয়েদের সে-কি উৎসাহ, সে-কি উৎন্মাদনা—

> ''ওই এল।
>
> খবরটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ফুলবাগানে। গাছের ছায়ায়। নদীর কিনারে। কে এল। কোথা থেকে এল। ভিনগাঁয়ের রাজপুত্তুর। ঘোড়ায় চড়ে না পালকিতে? এসব কথা বাড়ির মহলে রিনিঝিনি বাজে। কে যেন বাজায়। কেন এল দাদার সঙ্গে। শহরের লোক। থাকবে বেশ কিছুদিন। হাওয়া পরিবর্তন। কী যেন দাদা বলেছিল ফিসফিস করে। তা আবার সই ভ্রমর শুনেছে। কাঠবাদামের নীচ ডালে পিঁড়ি বেঁধে দোল খাচ্ছিল। কাঁচা-ডাঁসা পেয়ারা চিবুতে চিবুতে ঘাড় ঘুরিয়ে না শোনার ভান করে নিজের শরীরটা আরো জোরে দুলিয়ে দিয়ে উত্তর দিল— ঢঙ।''[৬]

শহরের ছেলে গ্রামে আসবে বলে বাড়িঘর আগে থেকেই পরিস্কার করা হয়েছে। সাজানো হয়েছে বাইরের ঘর, যেখানে থাকবে নবাগত অতিথি। যেদিন সত্যি সত্যি শহরের ছেলেটি এসে গেল গল্পের নায়িকা চরিত্র অবাক হয়ে তাকে দেখছে। যেন ছেলেটি ভিনগ্রহ থেকে এসেছে—

> ''পলকে ঘরের আড়াল থেকে বৈকালী তাকে দেখে চমকে গিয়েছিল। দাদা চিঠিতে যা লিখেছিল তার চেয়ে বেশি। এ যেন সত্যি রাজপুত্তুর। সঙ্গে নেই সৈন্য সামন্ত। আর নেই রানি। বৈকালী এক মুহূর্তেই এই প্রথম দেখাতেই কেমন যেন হয়ে গেল। দেহ মনে কিসের ঝিলিক। বুঝতে পারছে না।''[৭]

গ্রামের মেয়ে বৈকালি। তাই ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি তো দূরের কথা, কথা বলার মধ্যেও বিধিনিষেধ আছে। গ্রামজীবনের এই দিকটা জীবন সরকার জানতেন। আর জানতেন বলেই—

> ''ভ্রমরকে নিয়ে বৈকালী রান্নাঘরে মার সঙ্গে ব্যস্ত। নিজেকে একটু লুকিয়ে রাখছে।

ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা কথা বলে আসছে। সেই কথা ভালোভাবে শুনতে না পেলেও শোনার চেষ্টা করছে আড়ালে আবডালে। লুকিয়ে লুকিয়ে যে একবার দেখবার চেষ্টা করছেনা, তা নয়। পাছে কেউ ধরে ফেলে। ভ্রমর যা ফাজিল। সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেবে।"[৮]

গ্রামজীবনের সহজ-সুন্দর সারল্য, অনাবিল প্রকৃতি এবং সরল মানুষগুলি দেখে শহর থেকে আসা শিহরণ নামের ছেলেটির বিস্ময়ের সীমা নেই। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন—

"শিহরণ কোনোদিন গ্রামে আসেনি। প্রথম এই গ্রামে এসে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। গ্রামগুলি যেন জলের মধ্যে ভাসছে। সামনেই নদী। এক একটি বাড়ি নদীর বাঁধ। জলের কিনারে, ক্ষেতে সোনা রোদ্দুরের ঢেউ খেলে বেড়ায়। বাড়িতে কত রকম গাছ। কত পাখি।"[৯]

গ্রাম প্রকৃতির কোলে বসে ছেলেটির দিন অতিবাহিত হয় পাখির কলতানে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ চালিত আলো নেই, তাই— 'বৈকাল হারিক্যান ধরায়', অল্প আলোতে শিহরণকে আরো উজ্জ্বল লাগে। আলো হাতে বৈকালী কাছে আসতে চায়। গ্রামের বাড়ি বলে আত্মীয় স্বজনদের মন ভীষণ সংকীর্ণ। ছেলেটার সাথে কথা বললে কেউ যদি কিছু মনে করে বসে, সর্বদা এই ভয়।

শহরের ছেলে শিহরণ তাদের বাড়ির ছাদ থেকে অনেক অনেক আকাশ দেখেছে। কিন্তু গ্রামের আকাশটা যেন অন্যরকম। লেখকের ভাষায়, এখানে নদীর উপরে আকাশ দেখছে শিহরণ। এই দুই আকাশের সঙ্গে কোনো মিল নেই। দোয়েল পাখির দিকে তাকিয়ে শিহরণ অবাক হয়ে যায়। কি সুন্দর সাদা কালো পাখিটা ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ায়। একসঙ্গে একদণ্ডও বসে থাকে না। শিহরণও বসে থাকে না, ঘুরে ঘুরে দেখে। ধান কি করে শুকায়, কিভাবে বেতের বাটিতে মুড়ি খায়। লংকা গাছের ছোট ছোট লঙ্কা হাতে নিয়ে নাড়াচারা করে। গ্রামের মানুষদের আত্মীয়তাপূর্ণ মনোভাব ফুটে ওঠে সবসময় এবং তার পূর্ণপ্রকাশ অতিথিসেবায়। অনেক রকমের পদ রান্না করে অতিথিকে না খাওয়ালে গ্রামের মানুষজনের মন ভরে না। লেখক নিজেও গ্রামেরই সন্তান। তাই আচার-আপ্যায়ন তাঁর রক্তে। গল্প লিখতে বসেও গ্রামীণ এই সংস্কৃতি তিনি গল্পে বসিয়েছেন—

"মৌরলা মাছের চচ্চড়ি। পাতলা মশুরির ডাল। সরু করে কাটা আলুভাজা। সেদিন আবার বকফুল ভাজা দিয়েছিল। কী অপূর্ব। এই ক-দিন কত নিত্য-নতুন রান্না খেল যা কোনোদিন খায়নি। খেতেও ভালো লাগছে।"[১০]

গ্রামের মানুষদের কত কি কাজ। ফসল লাগনো, ঝাড়াই-মাড়াই, ধানসিদ্ধ, ধানশুকানো সবকিছু গল্পকার এঁকেছেন পরম মমতায়— ''ধান কি করে শুকোয়, কি করে বেতের বাটিতে মুড়ি খায়।''[১১] এই চিত্রগুলো দেখে শহর থেকে আসা ছেলেটির মনকে প্রশ্ন দিয়ে ভরিয়ে তুলে।

সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ বৃষ্টি। এমন কোনো সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাঁরা লেখায় বৃষ্টির প্রসঙ্গ আনেননি। এই বৃষ্টির ফোঁটা গ্রামের সুপারি, নারকেল, পেয়ারা, আম, জাম, কাঁঠাল গাছের মাথায় যখন পড়ে তখন গ্রামের সৌন্দর্য কেমন হতে পারে তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন সুন্দরভাবে—

> ''শিহরণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ মেঘলা। পশ্চিমদিকে কালো মেঘ জমেছে। গাছে বাতাস নেই। ঝোড়ো হাওয়া ছাড়ল। গাছের ডালে পাগলা বাতাস। ওই বৃষ্টি পড়ল। এক ফোঁটা দু-ফোঁটা করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। শিহরণ নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। নদীর মধ্যে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। কী সুন্দর লাগছে। অনুদের বাড়ির সামনেই নদী। পিছনে শস্যের জমি। অন্যদিকে খাল। অপূর্ব। ঘরের বারান্দা থেকেই এইসব দেখা যায়।''[১২]

কয়েকদিন ধরে গ্রামে বৃষ্টি চলছিল— অঝোরে। আবার মাঝে মাঝে এই রৌদ্র— এই বৃষ্টি। আকাশে কালো মেঘের ভেলা, গাছগুলি বৃষ্টিতে ভিজে হেলে পড়েছে। গাছের ডালে পাখি নেই, কেমন যেন চারপাশ ঝাপসা। এই দৃশ্য গ্রাম বাংলার যেকোনো বর্ষার দিনে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। লেখক জীবন সরকার নিজেই বলেছেন— গ্রাম বাংলার প্রকৃতিই তাঁকে গল্পকার করেছে। গ্রাম বাংলার যে চিত্র এঁকেছেন ভিনগাঁয়ের রাজপুত্তুর গল্পে তা পড়তে পড়তে আমাদের মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতার কথা।

গ্রামীণ সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব খুব বেশি। গ্রামজীবনে দেবতাই বড়ো কথা। সময় সময় রাষ্ট্র শক্তির বদল ঘটে কিন্তু গ্রামীণ জীবন চলতে থাকে একই খাতে— একই প্রবাহে। গ্রামীণ জীবনে দেবতাই বড়ো কথা। আর এখান থেকেই জন্ম নেয় অন্ধ কুসংস্কারের। আগাছা, জগদ্দল পাথরের মতো গেড়ে বসা এই অন্ধ কুসংস্কারগুলি গ্রামজীবন থেকে বিদায় নেয়নি। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস লিখতে গিয়ে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, সেই কৃষি প্রধান ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রামীণ ব্যবস্থা চিন্তার জগতে সেই একাধিপত্য ও রাজা প্রজায় একই ধারায় সম্বন্ধ, সেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ পরিহাস রসিক ইন্দ্রিয়ালু বাঙালী চরিত্র জীবনচর্চায় সেই একই পথে পরিক্রমা। খণ্ডিত জীবনবোধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের উচ্চকণ্ঠে বেদনা ইংরেজ আগমনের আগে এই সমাজব্যবস্থার

ভিত্তিতে আঘাত করেনি। যখনই রাজকীয় সংগ্রামে কোনো বিশিষ্ট জনপদ বৃদ্ধি হয়েছে, দলবেঁধে এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে পালিয়ে গেছে, তখনই গ্রাম্য সমাজে চাঞ্চল্য জেগেছে। কিন্তু এই ছিন্নমূল মানুষ হয় সংঘাতের অবসানে স্বস্থানে ফিরেছে অথবা নতুন গ্রামে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার ধারা চিরাচরিত ধাতেই চলেছে। গ্রামজীবনে ওঝা, বৈদ্য, গুনিন এদের আনাগোনা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। গাছের মূল, জলপড়া, তেলপড়া, লবণপড়া, বিভিন্ন জড়িবুটি গ্রামীণ মানুষগুলি সহজেই বিশ্বাস করে নেয়। জীবন সরকারের 'গুনিন' গল্পের কাহিনী আন্না নামের এক গুনিনকে নিয়ে—

> ''এরই মধ্যে কী করে যেন আন্না কিছু ঝাড়ফুঁক শিখে নিয়েছে। গাছ-গাছড়ার শেকড়বাকড় কুড়িয়ে ওষুধ দেয়। বাচ্চা হওয়ার সময় কেউ ডাক দিলে যায়। গাঁয়ের মানুষের কাছে আন্না কখন যেন হয়ে গেছে ধাইমা। আন্নাও খুব খুশি, যে যখন ডাকে চলে যায়। কাউকেই না করে না।''[১৩]

দূর দূর গ্রাম থেকে ডাক আসে আন্নার। ঝুরি নেমে আসা একটা বিরাট বটগাছের নীচ অংশটা পরিস্কার করে রক্ষাকালীর থান বানিয়েছে সে। অমাবস্যার রাতে কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে পূজা দেয়। আসলে এইগুলি সব লোক দেখানো। তবে এই কাজের জন্য তার অনুশোচনাও খুব প্রবল—

> ''মনে মনে বলে, অপরাধ নিস না মা। তুই তো জানিস, আমি কিছু জানিনে। পোড়া পেটের জন্য ঝাড়ফুঁক। তুই বল, ঝাড়ফুঁকে কিছু হয়?''[১৪]

আসলে গ্রামজীবনে ওঝা, বৈদ্যের উপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যে এখনো নির্ভরশীল এ গল্প তার প্রমাণ।

পালযুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে সুবিস্তৃত ও সুবিশাল ইতিহাস তা সাধারণত প্রাচীন এবং মধ্যযুগ নামে পরিচিত। দীর্ঘ এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো খুব একটা বদলায়নি। মাঝে মাঝে কেবল রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাঙালীর জীবনযাত্রা, দৈনন্দিনতা ও দিনযাপন থেকে গেছে একই রকম। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়—

> ''অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসীক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সে প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ ভারত বহুদিন পর্যন্ত, কতকাংশে হইলেও,

এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিক-শক্তির সঙ্গে) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার সমস্ত পথই গিয়াছিল রুদ্ধ হইয়া; এবং তাহার ফলে বাংলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাঙলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সজ্ঞান, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে এবং কিছু দিনের জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ধরনের একটা চেষ্টা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুকাদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনও চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাঙলার ঐতিহাসিক কৃষিনির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাঙলাদেশকে একেবারে ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর গ্রাম্য সমাজে পরিণত করিয়া দিল।”[১৫]

ধীরে ধীরে বাঙালী বুঝতে পারে—উন্নতি করতে হলে অবশ্যই বাংলার বাইরে যেতে হবে। জীবন এবং জীবিকার তাগিদে গ্রামবাংলার মানুষও ঘরের বাইরে যেতে চাইলো। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হরেক ধরনের পেশা নিয়ে প্রাণটা হাতে করেই বিভিন্ন কাজের নেশায় গ্রামীণ মানুষগুলোকে যেতে হয়েছিল। জীবন সরকারের ‘চালি’ গল্পটি এর উদাহরণ। গ্রামের মানুষ আবাদ করে ফসল ফলায় কিন্তু দাম পায় না। তাই বাধ্য হয় বিদেশ বিভূঁই-এ কাজ নিতে। বিদেশে কাজ করতে গিয়ে আত্মীয় স্বজন থেকে যেমন দূরে থাকতে হয়, তেমনি প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষা করে থাকে মৃত্যুর। ‘চালি’ গল্পে সদ্য বিয়ে হয়ে এসেছে গ্রামের মেয়ে পাটুলির। লোকেনের সঙ্গে কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে তার। লোকেনের বাবা মুলিবাঁশের চালি নিয়ে যাচ্ছিল যোগীঘোপা থেকে গোয়ালপাড়া। পথে ব্রহ্মপুত্রের জলে পড়ে যায় এবং ওইখানে ঘটে সলিল সমাধি। স্বামী লোকেন যখন বাবার পেশায় নিয়োজিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে যাতায়াতের প্রস্তুতি নেয়, তখন ভয়ে আশঙ্কিত হয়ে পাটুলি বলে—‘‘তুমি না যাবা।’’ লোকেন উত্তর দিল— ‘‘তুমি পাগল হলে নাকি। না গেলে খাবো কি?’’[১৬] এ প্রশ্ন গ্রামের রুটি রোজগারহীন যে কোনো মানুষের। গৃহ যেন তাদের কাছে আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পকারের ভাষায়—

''সারাদিন পরিশ্রম করে দুবেলা ভাত জুটে না। জিনিসপত্রের যা দাম। আর টাকার কি মূল্য আছে? অভাব অনটন লেগেই আছে। এটা নেই, ওটা নেই।''[১৭]

গ্রামের মানুষদের কিছু লৌকিক রীতিনীতি থাকে। কিছু লক্ষণ দেখে তারা বুঝে যায় কিছু একটা হতে যাচ্ছে। যেমন— ইস্টিকুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হবে, আমের মুকুল বেশি ধরলে খুব কালবৈশাখী ঝড় হবে, অনেক অনেক তেঁতুল ফললে বন্যা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বামী দূরদেশে আছে, কিন্তু— ''একটা চিল আকাশে উড়ছে। সেই ভোরবেলা থেকে।''[১৮] পাটুলি ভেবে নিল তার স্বামী নিশ্চয়ই আসবে কিছু দিনের মধ্যে। আসলে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট পরিস্থিতি প্রেম ভালোবাসা দাম্পত্যকেও যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল পাটুলির বিরহ তারই প্রমাণ। সারকথা হল, রাষ্ট্রশক্তি বারবার বদলালেও বাংলার প্রাত্যহিক জীবনে কোনো হেরফের ঘটে না। অর্থনৈতিক কাঠামো বা সমাজব্যবস্থা থমকে থাকে সেই একই তিমিরে। সমাজ ও সাহিত্য যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত তাই সমাজের সামগ্রিক চেহারা সাহিত্যে ফুটে তো উঠবেই। 'চালি' গল্পের ঘটনা তারই প্রমাণ।

সমাজ ও সাহিত্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, সম্পূরক-পরিপূরক আবেশিত। সমাজের সামগ্রিক চেহারা সাহিত্যে নানাভাবে ফুটে ওঠে। প্রেম ও ধর্ম সেখানে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকে। দুটোই একান্তভাবে সমাজ নির্ভর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে তাই ধরা পড়েছে অপরিবর্তনীয় সমাজেরই ছাপ। এখানে নেই কোনো বৈচিত্র্য, নতুনত্ব কিংবা বিধিভাঙ্গার প্রয়াস। একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ সময় অতিক্রমী মহৎ কবিরা বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

আবার প্রেমের কথা বললে বলা যায়, প্রচলিত রীতির বাইরে কাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন আরাকান রাজসভার কবিরা। প্রণয়মূলক রোমান্টিক আখ্যানকাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে সুবাতাস নিয়ে আসেন। আসলে কাব্যগুলি গ্রামীণ মানুষের ভাবনা, ধ্যানধারণা নিয়েই প্রযুক্ত। গ্রামীণ চিন্তাভাবনা, গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ পটভূমি তাঁদের লেখায় মোহময়তা সৃষ্টি করেছে। আবেগপ্রবণ বাঙালী জাতির সাহিত্য সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের গ্রামজীবনের হৃদয়ের ছাপ। উত্তরাধিকার সূত্রেও বাঙালী এই আবেগকে লালন করেছে সযত্নে। স্বাধীনতা পরবর্তী গল্পকার জীবন সরকারের 'কাছিম' গল্পেও দেখি গ্রামজীবন, সেই সঙ্গে প্রেম আর ধর্মসাধনার বর্ণনা একাকার

হয়ে গেছে। গ্রামজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা আছে জীবন সরকারের 'কাছিম' গল্পে। ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এই গল্পের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক ব্যালজাকের গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। মাছ ধরার কাহিনী নিয়ে গল্পটি লিখিত হলেও গল্পটির ভেতরে জীবন সরকারের মরমিয়া দরদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ছেন্টু, পিঙ্গলি চরিত্রগুলি সার্থক গ্রামীণ সমাজের দ্যোতনা হয়ে উঠেছে। গল্পকথকের বাল্যবন্ধু ছেন্টু। একই সঙ্গে ছোটথেকে বড়ো হয়েছে। গলায় গলায় ভাব। যেখানেই যায় ছেন্টু সেখানে থাকবেই। এই দুই বালক সারা গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। এদের চোখে গ্রামের সেরা লাবণ্যময়ী বালিকা পিঙ্গলি—

> ''পিঙ্গলি সবেমাত্র কাপড় পরেছে। সাদা সাদা রং। দোহারা গড়ন। ঢালো-ঢালো শরীর। গায়ে জামা নেই। চেকলুঙ্গির মতো কাপড় পরনে। লাবণ্যে ভরা দেহ। যখন হাসে নদী যেন উপচে পড়ে।''[১৯]

এই দুইজন বালকই পিঙ্গলির মন পেতে চায়। কিন্তু পিঙ্গলির মন ছেন্টুর দিকেই বেশি। আসলে ছেন্টু অনেক কাজ করাতে খুব দক্ষ। বিশেষ করে মাছ ধরাটা, এখানেই টেক্কা দিয়েছে ছেন্টু পিঙ্গলির মন জয় করে নেবার প্রতিযোগিতায়। গল্প-কথকের আক্ষেপ— মাছ যে সে ধরতে পারে না, টান দিলে মাছ উঠে না, পিঙ্গলি ঘাটে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ করে এবং খিল খিল করে হেসে লুটোপুটি খায়।

গ্রামীণ মানুষগুলোর প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। ফাল্গুনে বীজবোনা আর বর্ষায় গ্রাম বাংলায় গেলে পাটপচার গন্ধ গ্রামের যেন নিজস্ব সম্পদ। গ্রামজীবনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল বলেই জীবন সরকার লেখেন—

> ''পিঙ্গলি পাট নিচ্ছিল, আমার কাণ্ড কারখানা দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ফেললো। ওদের জমিতে পাট হয় না। আমাদের বাড়িতে পাট নিতে আসে।''[২০]

পাট নিড়ানোর হাজার কলাকৌশলের চিত্রও লেখক তুলে ধরেন—

> ''যা নিড়োবে তার অর্ধেক পাটকাঠি সে পাবে, এই নিয়ম।''[২১]

আসলে এই পাটখড়িগুলি গ্রামের মানুষের উনুন ধরানোর প্রধান অবলম্বন।

গ্রামজীবনে ধর্মের প্রভাব বিরাট। প্রতি সন্ধ্যায় পালা করে কীর্তন গান, শিবের গান, গ্রামে গেলেই শোনা যায়। 'কাছিম' গল্পে আমরা দেখি এক বাড়িতে ত্রিনাথের গান বা দেবাদিদেব শিবের গানের আসর বসেছে। ঘরের মধ্যে কিছু লোক বসেছে। মাঝখানে জলচৌকির আসন পাতা এবং সেখানে সাজানো ফুল, বেলপাতার ঘট। ধূপের ধোয়ায় ঘর ভর্তি। পালাগান হচ্ছে। সবাই গায়ক।

সকলেই মাথা নাড়ছে। গাজার কলকে একহাত থেকে আর একহাতে ঘুরছে। করতাল আর খোলের শব্দে শুচিশুদ্ধ পরিবেশ। একপাশে বসেছে মেয়েরা। সকলেই একসাথে গাইছে— একপয়সাতে হয় যার খেলা, কলিতে তিন নাথের মেলা। মেলায়-লেগেছে ধুম— পড়ছে ধুম— ''বোভম্ বোভম্ ভোম্ভোলা। কলিতে তিননাথের মেলা।''[২২]

সবাই তালি দিচ্ছে, করতাল বাজাচ্ছে, ঘন ঘন উলুধ্বনি পড়ছে। সত্যি এই চিত্রই গ্রাম জীবনের নিজস্ব আকর্ষণ।

গ্রামসমাজে থাকে বিভিন্ন পাড়া বা পল্লী। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, কুমোরপাড়া, জেলেপাড়া, তাঁতিপাড়া, জমিদারপাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পুবপাড়া, পশ্চিমপাড়া, কখনো বা হিন্দুপাড়া, মুসলমানপাড়া। আর কোথাও কোথাও হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, ফকিরপাড়া ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত কিছু নিয়েই গ্রাম বাংলার জীবন। এই গ্রাম বাংলার বাজারে সপ্তাহে দুদিন গ্রামীণ মানুষ উৎপাদিত দ্রব্য যেমন বিক্রি করে, তেমনি নিজেদের আহার-বস্ত্র-ঔষধ এই দুই দিন কিনতেই বেশি পছন্দ করে। 'অচেনা বৈকালী' গল্পে লেখক দেশভাগের পর যে অঞ্চলে ওঠেছিলেন, সেই ধূপগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন পাড়ার বর্ণনা যেমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন তেমনি ধূপগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাটের চিত্রও খুব সুন্দরভাবে এঁকেছেন—

> ''এই কিছুদিন আগেও ধূপগুড়ি বাজার এত জমজমাট ছিল না। তবে পাইকারি আনাজ, ধান, পাট, রবি শস্য প্রচুর আমদানি রপ্তানি হত। দেশভাগের পর এই হাট শহর হয়ে গেল। কোথা থেকে যে এত লোক এল ভাবাই যায় না। চারপাশেই গিজগিজ করছে। এই ভিটে রবীনের সেজোমামার ছিল। পাশে রতন মজুমদারের দোকান। একটু দূরে যতীন দত্তের-দীনেশ দত্তের দোকান। সেজোমামা মারা যাওয়ার পর রবীন এই ভিটেয় দোকান দেয়। ভালোই চলছে। ওর পাইকারি কারবার। খুচরোও বিক্রি করে। নানাপ্রান্ত থেকে লোকজন আসে। সেজোমামা নাথুয়া, চামুর্চি, গয়েরকাটায় হাট করতে যেত। সেদ্ধভাত খেয়ে হাঁটবাসে যাওয়া, ফেরাও ছোটবাসে। তখন তো ঝকঝকে নতুন নতুন বাস সার্ভিস। যাতায়াতে আগের মতো কোন কষ্ট নেই। হাট যেদিন থাকত না সেদিন পায়ে হেঁটে হেঁটে কতগ্রাম যে পার হয়ে যেত তার কোনো লেখাজোখা নেই। ফেরার সময় চাল, বেগুন, আলু, এমনকী ধান নিয়ে আসত। কেউ হয়ত শাঁখা নিয়েছে হাতে কিন্তু টাকা নেই। টাকার বদলে চাল, কিংবা আলু যে যা দিত-নিয়ে নিত।''[২৩]

আসলে গ্রামজীবনকে হাতের তালুর মতো চিনতেন বলেই জীবন সরকার গ্রামের সমস্ত খুঁটিনাটিকে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

অখণ্ড বাংলার গ্রামজীবন এক সময় ছিল নিসর্গের এক মায়াময় ভূখণ্ড। এক স্বপ্নের জগত। শান্তির পীঠস্থান। মাঠ, ঘাট, খাল, বিল শত জলধারায় বহমান অজস্র নদী, অফুরান শস্যক্ষেত্র, নানা বর্ণময় পাখি, ফুল-ফল, বৃক্ষলতা, নানা জাতি, নানা মানুষ— সবমিলে সেদিনের গ্রামবাংলা ছিল অনেকটাই শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, উত্তেজনাশূন্য। আকাশে, বাতাসে তখন জারি ভাঁটিয়ালি সুর। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তখন বড়োই মধুর। হিংসায় ভরে যায়নি মানুষের মন। বাসিন্দারা ছিল বড়ই সাদাসিধে, অকপট। তাদের চোখেমুখে মাখানো থাকত অদ্ভুত সারল্য। জীবন বয়ে যেত ধীর চালে, তীরতীরে স্রোতের মতো। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাও ভাগ হয়ে গেল। এই ঘটনা তছনছ করে দিল গ্রাম বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের বোধ বিশ্বাস সবকিছু। অখণ্ড, অবিভাজ্য যে বাঙালী জাতি এতদিন সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত গৌরব, মহিমা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ভুলণ্ঠিত হল তার উন্নত উজ্জ্বল মহিমা। দেশভাগের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে গ্রামজীবনে সৃষ্টি হল বিশৃঙ্খলা। মানুষের বহির্জীবনে এবং মনস্তত্বের গভীরে তৈরি হল এক সংকট। গভীর শূন্যতা। দেশভাগ তো কেবল আঞ্চলিক ভাগাভাগি নয়, এ হল কোটি কোটি মানুষের মনের ভাগাভাগি। হৃদয়ের বিভাজন। এ বিভাজনের ঘূর্ণিঝড় বাংলার গ্রামজীবনেও আছড়ে পড়েছিল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢল নামলো পথে। গ্রাম বাংলা পরিণত হল শ্মশানভূমিতে।

জীবন সরকার নিজেও এই দেশভাগের ঘুণকাঠে বলি একজন মানুষ। তাই গল্প লিখতে বসে দেশভাগের সময়ে গ্রাম বাংলার উত্তাল পরিস্থিতিভরা জীবনের চিত্র নিয়ে তাঁর গল্পের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। দেশভাগের সময়ে গ্রাম বাংলার বিপদভরা দিনগুলির অসামান্য বর্ণনা আছে ‘শহীদ বলরামপুর’ গল্পে। দেশভাগজনিত কারণে তৈরি হওয়া দাঙ্গা পরিস্থিতিতে গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়িতে গরম জলের সাথে লঙ্কা মিশিয়ে রাখা হত। গুণ্ডারা এলেই ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। দাঙ্গার গুজবে গ্রাম বাংলার হিন্দুরা আত্মরক্ষার তাগিদে লাঠি, দা, ছেনি ইত্যাদি নিয়ে যেন যুদ্ধের সাজ সাজ রবে দিন কাটাত— ‘‘বলরাম গেছে ইমামগঞ্জে। রাম-দা, চাপার বানাতে দিয়েছে কামার বাড়িতে। বেতের লাঠি, বাঁশের লাঠি বানাতে দিয়েছে।’’[২৪] দেশভাগের সময়ে বঙ্গদেশের পূর্ব অংশের মুসলমান অধ্যুষিত (যা পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ) জেলাগুলোর গ্রামেগঞ্জে এতদিন ধরে প্রতিবেশী হয়ে বাসকরা সব মুসলমান যে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল

তা নয়। অনেক মুসলমান দাঙ্গাকে ঘৃণা করে হিন্দুদের বাঁচাতে সাহায্যও করেছিল। তবে তা ছিল নামমাত্র, হাতেগোনা। জীবন সরকার সেই হাতে গোনা হৃদয়বান গ্রামীণ মানুষদের চিত্রও তুলে ধরেন সহানুভূতির সঙ্গে—

> ''গ্রামের মোড়ল মকবুল মিঞা হিন্দুদের যেতে বারণ করছে। বলেছে— তারক চাচা, আপনারা যাবেন না। আমি থাকতে, আমার ছেলেরা থাকতে একটা গুণ্ডাকেও ঢুকতে দিবো না। আমাদের গ্রামে কেউ তো ছুরি চালাবে না। ঢাকা থেকে আসবে? আমরা পাহারা দিচ্ছি ধলেশ্বরীর পাড়ে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। মোটকথা এই গ্রামে আমরা থাকতে গুণ্ডাদের আসতে দিবো না। প্রাণ থাকতে বাধা দিবো। আপনারা যে যার বাড়িতে থাকুন। শন্তিতে থাকুন। ভয় পাবেন না।''[২৫]

কিন্তু মোকবুল মিঞা যাই বলুকনা কেন হাজার হাজার ভিনদেশী গুণ্ডার সাথে গ্রামের কয়েকজন কি করবে? কি করে বাধা দেবে? এদের হাত থেকে বাঁচতে তাই ধলেশ্বরী নদীর পাড় দিয়ে বাঁশ বেঁধে হেজাক টাঙ্গিয়েছে গ্রামবাসীরা। সারারাত জেগে পাহারা দিচ্ছে গ্রাম। কেউই স্বস্তিতে থাকতে পারছে না। গ্রামের সব হিন্দু বাড়িতেই ভাতের হাড়ি চড়ছে না উনুনে। ফসলের ক্ষেতে চাষ নেই। নদীতে মাছের ডিঙি নেই। কেমন একটা হতাশার ছাপ সবার চোখে মুখে। কোনো কাজেই মন নেই। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না। বিয়ে সাদি, পূজা-পার্বণ সব বন্ধ। সে পরিস্থিতির চিত্র জীবন সরকার যেভাবে এঁকেছেন তাতে পাঠকের রক্ত হিম হয়ে যায়—

> ''জোরে কেউ ডাক দেয় না। বাচ্চারা কাঁদে না। অসুখ বিসুখ হলে দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেউ যায় না। ওষুধ তেমন মিলে না। আস্তে আস্তে অনেকেই ঘর, ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করছে রাতের অন্ধকারে। জমি ছেড়ে দিচ্ছে। বিক্রি করে দিচ্ছে। হাঁসেরা জলে নামছে না। গোরু যাচ্ছে না মাঠে। কুকুরগুলি চুপচাপ দাওয়ায় বসে কুণ্ডুলী পাকিয়ে। পাখিরা ডাকছে না গাছে। গাঁদা, মালতী, টগর ফুলের গাছে ফুল নেই। গ্রামগুলি যেন আফিম খেয়ে ধুঁকছে। চিঠিপত্র আসে না। নেপাল কাকা দুধ নিয়ে ঢাকায় যায় না। ব্যাপারি আসে না পাট নিতে। একটা চাপা অরাজকতা চলছে।''[২৬]

ভূটানের নদীগুলিতে বৃষ্টি হলে সহজেই জলে টইটুম্বুর হয়ে যায়। আর সে জল ভুটান ছেড়ে দিলে ডুয়ার্সের বিস্তৃর্ণ এলাকা সহ আসামের বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই বন্যার আতঙ্কে এবং গুজবে গ্রামবাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয় তা নিয়ে গল্প 'পানি আহিছে'। ''আজ ক'দিন থেকেই রাস্তাঘাট, বাজারে, দোকানে সকলের মনেই আতঙ্ক। জল

আসছে।”[২৭] সারা গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক— জল এলে কে কোথায় উঠবে, কে কি করবে শুধু একটাই চিন্তা, একটাই আতঙ্ক। রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, সাইকেল আরোহী সবাই হাটে-বাজারে এই নিয়েই আলোচনা করছে। আসলে গ্রামীণ মানুষের এটা সহজাত বৈশিষ্ট্য সকলে মিলে একসাথে থাকা এবং সবার সঙ্গে সবকিছুর আলোচনা করা।

উত্তরবঙ্গে বসবাসের জন্য উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি যেমন জীবন সরকারের লেখায় প্রাণবন্তভাবে এসেছে, তেমনি এসেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির লোকাচার, পূজাপার্বণ, লোকগান ইত্যাদির কথাও। ‘হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া’ গল্পটি গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনজাতি রাজবংশীদের লোকদেবতা তথা বৃষ্টি আনার দেবতা হুদুমকে নিয়ে লিখিত। আসলে গ্রামের অর্থনীতি চাষ আবাদ নির্ভর। জমির ওপরই তাদের সবকিছু আশা-ভরসা। ধান, পাট যা হয় তা দিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। চাষ আবাদের প্রধান সময় বর্ষাকাল। গল্পটা শুরু হয়েছে এইভাবে—

> ‘‘চারপাশে ধূ-ধূ মাঠ। খাঁ খাঁ করছে। আগাছা রৌদ্রে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বাতাসে আগুনের হলকা মাঠময়। গাছ-গাছালি রোদের তাপে ঝিমুচ্ছে। জমির মাটি ফাঁটা ফাঁটা, ভূমিকম্প হয়ে যেন ধরিত্রীর মাটি ভাঙচুর হয়ে গেছে।”[২৮]

গল্পের নায়ক মনা। সে আবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। নিজে একজন কৃষক এবং গ্রামের বাকি কৃষকদের জন্যেও সে সবসময় ভাবে। অথচ এবার বর্ষায় এখনো একটুও বৃষ্টি হল না। মনার তাই আকাশে মেঘ দেখলে বুকে জল আসে। বৃষ্টি নেই বলে কেউ-ই মাঠে লাঙল নিয়ে নামতে পারছে না। রেললাইনের পাশে জলের নালা শুকিয়ে কাঠ। পুকুরের জল তো কবেই শুকিয়ে গেছে। বৃষ্টির জন্য চারিদিকে হাহাকার। যদি চাষ না হয়, তাহলে যে না খেয়ে মরতে হবে। জমিতে ধানবীজ ছড়িয়ে দেবার এটাই তো সময়। তাকে বড়ো করার দায়-দায়িত্ব কৃষকের। ভালো করে যত্ন করলে ভালো ধান হবে, কৃষকের ঘরে হাসি পৌঁছে যাবে। ‘‘বছরের পেটের খোরাক, একটু এদিক ওদিক হলেই— কৃষকের চিন্তা।”[২৯] আসলে বৃষ্টি না হওয়াটাও একটি অন্যতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বহুবার আমাদের দেশে খরা এসেছে। খরার ফলে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। বহু মানুষের মৃত্যুও হয়েছে খরার জন্য। তাই শঙ্খ ঘোষ লেখেন—

> ‘‘অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ ধূ বালুর মাঠ
> সেইখানে সে একলা হাঁটে,
> সেইখানে সে কাঁদে।
> গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁধে-পোড়া এ তল্লাটে

কপাট খুলে মরল,

ও মেঘ বর্ষা দে, বর্ষা দে—

বর্ষা দিল না,

চক্রবালি বক্রবালি তৃষ্ণা দিল পা।”[৩০] (জ্যৈষ্ঠ/৬০)

আকাশে মেঘ দেখলেই মনার চোখে হাসির রেখা। কিন্তু একটু পরেই তা দুঃশ্চিন্তায় মিলিয়ে যায়। মনার একার চিন্তা তো নয়, এই গ্রামের সকলের চিন্তা। মাঠে ঘাস নেই, গরুর খাবার নেই, পানীয় জলের জন্য দূরে পঞ্চায়েত পুকুরে যেতে হয়। টিউবয়েলের জলও শুকিয়ে গেছে। পুকুরে যেটুকু জল আছে সেখানেই স্নান, গরুকে স্নান করানো, জল খাওয়ানো সব। আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় গ্রামের মানুষগুলোর। মাঠের দিকে তাকানো যায় না, ঝলসে গেছে সব।

গ্রামীণ জীবনের বড়ো অঙ্গ বিভিন্ন লোকসংস্কার। ইষ্টিকুটুম পাখি ডাকলে আত্মীয় আসবে, জোড়াশালিখ দেখলে শুভ যাত্রা, পিঁপড়ের সারি সারি লাইন দেখলে বৃষ্টির সম্ভাবনা— এগুলি আসলে গ্রামীণ জীবনেরই এক বদ্ধমূল ধারণা। আসলে মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাসে গ্রাম খোদিত আছে স্বর্ণ-অক্ষরে। অতি প্রাচীন বাংলার কৌম সমাজে পশু-পাখি শিকার করেই খাদ্য আহরণ করা হত। খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসন সমূহে এদের ক্ষেত্রকরণ, কর্ষকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ডাক ও খনার বচন সমূহ একহিসেবে কৃষিকর্মের উদ্দেশ্য সাধনের কিংবা আবহাওয়া তত্ত্বকে বোঝানোর জন্যই। যেমন—

১. ‘পাঁচ রবিবার মাসে যায়

ঝরা কিংবা খরা যায়।’[৩১]

২. ‘চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।

নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।’[৩২]

৩. ‘পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়।

সেই বৎসর বন্যা হয়।’[৩৩]

৪. ‘আমে ধান। তেঁতুলে বান।’[৩৪]

আসলে কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকা। তাই এই সংস্কারগুলি কৃষিকে কেন্দ্র করেই এসেছে। গল্পেও আমরা দেখি, মাটির দিকে তাকিয়ে মনা দেখে পিঁপড়ের সারি দেখা যায় কিনা। ‘‘মাটির নীচের গর্ত থেকে পিঁপড়ে উঠলে বৃষ্টি হয়। বুড়ো লোকেরা সেইকথা

বলে।”[৩৫] কিন্তু কোথাও পিঁপড়ে নেই। মনা এক পা এক পা করে মাটিতে নামলো। মাটি থেকে গরম ভাপ বেরুচ্ছে। নীচটা মনে হয় আগ্নেয়গিরি। গ্রামীণ অর্থনীতি যে কতটা কৃষিনির্ভর মনার দুঃশ্চিন্তায় তা স্পষ্ট করেছেন লেখক—

> ‘‘জমিতে ধান না ছিটাতে পারলে কি করে ধান হবে। আর যে দিনকাল পড়েছে। জিনিসপত্রের যা দাম। তেল, নুন চালের দামই কত। মুখে তো দুমুঠো ভাত দিতে হবে। তার মধ্যে বউ পোয়াতি। গর্ভে সন্তান। এখন যে পেট ভরে খাবে তার কোন উপায় নেই। ধাইমা বলেছে মাছ খাওয়াতে। দেশে তো জল-ই নেই। মাছ পাবে কোথায়? এই সময় যত্নআত্তি করা দরকার। কিন্তু কি করেই বা করবে কে জানে। আর কয়েকটি দিন গেলে, শহরে গিয়ে রিকশা টানবে। বউকে না খাইয়ে তো রাখা যাবে না।”[৩৬]

প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে যখন মানুষ দিশেহারা, যখন মানুষের আর কিছু করার থাকে না, তখন মানুষের সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগায় ওঝা, গুনিন, দরবেশ ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা। গ্রাম-জীবনে এদের প্রভাব বিরাট। বুকের মধ্যে আস্ত গ্রামের সুগন্ধ নিয়ে লিখতে বসে লেখকের কলম এই দিকটাকেও অস্বীকার করতে পারে না— ‘‘ফকির বাড়ি গিয়ে ফকির বাবাকে বললে কেমন হয়?”[৩৭] যদি ফকির বাবা বৃষ্টি এনে দিতে পারে, যদি বৃষ্টি নামে। জমিতে লাঙলের যজ্ঞ শুরু করা যাবে। লাঙল দিলেই তো ফসল হবে। ঘরে ঘরে ধান উঠবে। সকলের মুখে হাসি ফুটবে। গান গাইবে। ঢেঁকিতে পা পড়বে। ঘরের উঠোনে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করবে। ধানের গোলা উঠবে, চারপাশে আলপনা দেবে। ফকির বাবা নিদান দেয়— হুদুম দেবতার পুজো দিতে হবে। এই হুদুম দেবতার পূজার অধিকারী কেবলমাত্র মহিলারাই। রাত্রির অন্ধকারে মহিলারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গান করে করে হুদুম দেবতাকে প্রসন্ন করে। হুদুম দেবতার পুজোর জন্য গ্রামের মহিলাদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। উঠোনের মধ্যে গোবর দিয়ে লেপা হয়েছে, তার মধ্যে একটা পিঁড়ি রাখা, তার উপরে মাটির ঘট। কিছু ফুল, দুর্বা, বেলপাতা রাখা হয়েছে। গল্পের নায়ক মনার স্ত্রী গর্ভবতী। তবুও সে অংশগ্রহণ করেছে অনুষ্ঠানে। মনার আনন্দ ও আশঙ্কাকে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য ভাষায়—

> ‘‘পোয়াতি। কি জানি কি হয়। আজকে যে এইরকম একটা ব্যাপার হবে তা আগেভাগে কোন খবর পায়নি। আজকে টগরি খায়নি কিছু। বরুণ দেবতার নামে উপবাস করেছে। মনার ভালো লাগল একথা ভেবে বাড়ির গৃহিণীরাও ভেবেছে— ওরাও আলাদা নয়। ওরাও মনে প্রাণে চাইছে বৃষ্টি নামুক। বৃষ্টি না হলে জমি উর্বর হবে

না। ফসল হবে না। মায়েদের মুখে কিছু না দিতে পারলে কি করে পৃথিবী রক্ষা পাবে। মেয়েরা তো বৃষ্টির আর এক রূপ। ওরা উর্বর না হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরাই তো জীবনের লাঠি।"[৩৮]

মনা গ্রামের ছেলে, তাই হুদুম পুজোয় কি হয় তা সব তার জানা। এই রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে মনাদের সমাজে। মনা এগুলিকে বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাসও করে না। দু-একবার যে বৃষ্টি হয়নি তা নয়। হয়তো হওয়ার কথা ছিল। গান গাওয়ার পর হয়েছে।

আসলে সেটা তো কাকতালীয়। আবার কোনোবার সেসময় বৃষ্টি হয়নি। পরে হয়েছে। তবু মানুষ বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে আছে। এখনো গ্রামের মানুষ জমিতে লাঙল চালাবার সময় মাটিতে হাত দিয়ে জমিকে প্রণাম করে। আকাশকে প্রণাম করে। এই প্রথা চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে গ্রামীণ মানুষগুলোর মধ্যে। শুরু হয়ে যায় হুদুম গান। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। বৃষ্টির জন্য কামনা করছে গ্রামের মহিলারা, গ্রাম বাঁচাতে, নিজেদের জীবন বাঁচাতে—

"চোখের সামনে ভেসে উঠল উলঙ্গ মহিলাদের দেহ। কেউ যুবতী রজঃস্বলা, কেউ গর্ভবতী। নিজের বউ টগরির গলাও ভেসে আসছে। ওদের গান চলে যাচ্ছে আকাশে মেঘের ঘরে।"[৩৯]

জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে রেল লাইনের ধারের নালায়। গাছেরা পাতা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে। মাঠের চারপাশে জ্যোৎস্নার খই ফুটছে যেন। মাটি ফেটে সোনা গলগল করার মতো। রাত-জাগা পাখিরা বসে আছে ওদের গান শুনে—

"হিল হিলাছে কমোরটা মোর শির শিরাছে গাও।
কোনঠে কেনা গেলে এলা হুদুমা দেখা পাও।
পাটানি খানি পড়েছে খসিয়া
হুদুমা দেখা দেওগো আসিয়া।"[৪০]

একজন গাইলে পরে সকলে মিলে সেই কথাগুলি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে। চারপাশে জ্যোৎস্নার হাট। চাঁদের আলোয় নারীদেহ হেলিয়ে দুলিয়ে হুদুমাকে বরণ করছে। হুদুমার কাছে নিজেদের শরীর দিতে চাইছে। ভরা যৌবন হুদুমা যেন গ্রহণ করে সেই কথা গানের ভাষায় ফুটে উঠেছে।

বাতাস ছাড়ল গাছের পাতায়। মাটি যেন ভেজা ভেজা লাগছে। ওরা এলোচুলে ঢেউ তুলে গাইছে—

''আইস করে হুদুমা রসিয়া

তোর পদে মুই আছে বসিয়া।''[৪১]

পাখিরা নড়েচড়ে বসল। কোথাও একটা ভুতুম পাখি ডেকে উঠল। পঞ্চায়েত পুকুরে মৃদু ঢেউ। বাতাসের গায়ে জলকণার বিন্দু ভেসে আসছে। একসঙ্গে এতগুলো উলঙ্গ রমণী পাগলের মতো গান গাইছে। থামবার নাম নেই। ওরা যেন এই জগতে নেই। নেশায় পেয়ে বসেছে। ওরা টলছে। ওরা গোল গোল হয়ে নাচছে। কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। সকলেরই এক চেহারা। কেউ কাউকে দেখে হাসছে না, লজ্জা পাচ্ছে না। যে যার মতো গাইছে—

''ডিংসালি ডিংসালি কমোরটা

তাতেও নাই মোর ভাতারটা

কব কি মুই; কায়বা কয়

কোনঠে গেলে দেখা হয়

দেখা হলে দেহাটা জুড়ায়।''[৪২]

মাঠের মধ্য দিয়ে একটা উত্তাল হাওয়া চলে গেল এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। ''বহুদিন পর একটা পাগল হাওয়া বয়ে গেল জেট প্লেনের মতো।''[৪৩]

এক নিমিষে জ্যোৎস্না চলে গেল। আকাশ কালো হয়ে গেল। অন্ধকারে কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না কেউ। ওদের উলঙ্গ শরীরে আরো কালি ঢেলে দিল কেউ। ওরা কিন্তু থামছে না। ওদের শরীরে আগুন জ্বলছে। ওদের পা পুড়ে যাচ্ছে। ওদের বুকে; তলপেটে নামছে আগুনের ঢল। হাত-পা ভারী। অবশ অবশ লাগছে। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। ঠিকমতো পা রাখতে পারছে না মাটিতে। ফাটা ফাটা জমিতে ওদের শরীরের ঘাম ঝরে পড়ছে টুপটাপ। ওরা গাইছে—''হিল হিলাছে কমোরটা মোর শির শিরাছে গাও, কোনঠে কেনা গেলে এলা হুদুমা দেখা পাও। পাটানি খানি পড়েছে খসিয়া আইস করে হুদুমা দেওয়া, রসিয়া রসিয়া।''[৪১]

উলঙ্গ শরীরের দোলায় বৃষ্টির জল, বৃষ্টির ফোঁটা। কালভার্টের জলে শালপাতায় টুপটাপ টুপটাপ ফোঁটা। বৃষ্টির ফোঁটা। গাছ-গাছালির গায়ে এলোমেলো বাতাস। পাখিরা ডানা মেলে মাটিতে নামছে। পিঁপড়েরা মাটির তলা থেকে বেরিয়ে জমির আলে। এসব ওরা দেখছে না। ওরা যেন গানের ভাবে উতলা হয়ে পড়েছে। আধা আধা স্পষ্ট গান গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। শব্দ আসছে অল্প অল্প। আকাশ কালো হয়ে নেমে এল ধরিত্রীতে। ওরা গোল হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। বৃষ্টির জল ওদের উলঙ্গ শরীর ধুয়ে ধানখেতে নামল। ওরা বুক ভরে বৃষ্টি নিল ভিতরে। পূর্ণিমার আলো সরে

গিয়ে আকাশ ভরে গেল কালো মেঘে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় মেয়েদের উলঙ্গ দেহ বৃষ্টির জলে এক হয়ে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলসে গেল মায়াময় জগত।

কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের-এ এক সুন্দর বর্ণনা। গল্পকার জীবন সরকার তাঁর গল্পে কৃষক এবং কৃষিকাজকে সম্মান জানিয়েছেন। কৃষকরাই যে সভ্যতার পিলসুজ। কৃষক এবং গ্রামের উন্নয়ন হলেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব। তাঁর গল্পে বারবার ধ্বনিত হয় কৃষক আমাদের অন্নদাতা এবং গ্রাম আমাদের আত্মা।

গ্রামজীবনের অন্যতম অঙ্গ লোকসঙ্গীত। গ্রামে ভোরে কিংবা সন্ধ্যায় লোকগানের লহরিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। জীবন সরকারের জন্ম গ্রামে, লোকসঙ্গীতের প্রভাব তিনি জানতেন। তাই তাঁর গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে লিখিত গল্পগুলিতে অনিবার্যভাবে এসে গেছে লোকগান। 'ভালো থেকো' গল্পে তাই দেখা যায় শিশু-কিশোরেরা যখন বিকেলবেলা কানামাছি, গোল্লাছুট ইত্যাদি গ্রামীণ লোকক্রীড়া খেলতে ব্যস্ত তখন ঘরের দাওয়ায় বসে এক বৃদ্ধ গান গাইছেন—

''প্রাণ সখিরে ওই শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে
বংশী বাজায় কে সখী বংশী বাজায় কে
আমার মাথার বেণী খুইল্যা দিমু তারে আইন্যা দে—''[৪৫]

'হারানো ঠিকানা' গল্পে দেশভাগের ফলে বিপর্যস্ত ভাগ্যহত লোকটি কিছুতেই ভুলতে পারছে না তার ফেলে আসা গ্রাম, গ্রামের পুকুর— নদী-মাঠ-ঘাট। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন নিজের ফেলে আসা মাতৃভূমিতে আবার পা রাখবেন। গ্রামের বিরাট শীতলাতলার বটগাছটার নিচে খড় দিয়ে ঘর বেঁধে তিনি থাকবেন। ভোরবেলায় উঠে চাল-ডাল-সবজি চাষিদের বাড়ি থেকেই এনে জীবন ধারণ করবেন। আর সারাদিন ধরে গাইবেন—

''চাতক পাখির এমনি ধারা
তৃষ্ণাতে প্রাণ যায়গো সারা,
অন্য বারি পায় না তারা
মেঘের জল বলে
দেখে কত দেয়গো
তবু চাতক মেঘের ভুলি
অমনি মত হলে আঁখি

শোধন মেলে।।”[৪৬]

এই গানগুলিতে গ্রামীণ মানুষদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের দিক ধরা পড়েছে। অল্পেতেই তারা খুশি এবং সুখী হতে চায়। গ্রামীণ গানগুলিতে সে কথাই ধরা পড়েছে।

জীবন সরকার গ্রামজীবনের অসামান্য রূপকার। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনচর্যা, তাদের সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার, বাসস্থান, লোকগান সবকিছুরই পরিচয় আছে। মাটির সঙ্গে জীবন সরকারের সম্পর্ক যে ছিন্ন হয়নি, বরং সারা শরীর জুড়ে তা আরও বেশি করে লেপ্টে ছিল তা তাঁর গ্রামজীবন বিষয়ক গল্পগুলি পড়লেই অনুভূত হয় এবং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনও চলে যায় গ্রামীণ জীবনের অন্দরমহলে। কবি জসীমউদ্দিন-এর কবিতা দিয়ে বলা যায়—

‘‘তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি,
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়।”[৪৭]

মৃত্তিকাগন্ধী গ্রামজীবনের রূপকার জীবন সরকার। তাঁর গ্রামজীবন কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে গ্রামবাংলার যে স্বভাবজ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা একান্তভাবে গল্পকারের চোখে দেখা গ্রামবাংলা। গ্রামজীবন এবং গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে। কিন্তু জীবন সরকারের গল্পগুলিতে যেভাবে গ্রামীণ মানুষের স্বরূপ ও যথার্থ পরিচয় আর মাটির গন্ধ লেপ্টে আছে তা সত্যিই বড় দুর্লভ এবং অনন্য। আর এখানেই জীবন সরকারের স্বতন্ত্রতা।

জীবন সরকারের গল্পে নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গ:

‘‘ফেলে যাওয়া
আকাশ অভেদী সাদা বকের ডানা
কিংবা মরে যাওয়া শঙ্খঝিনুকের খোল
অথবা সুমিষ্ট ফলের পচে যাওয়া হৃদপিণ্ডের মত
জীবনে এখন জেগে থাকে বিষাদ,

বিলুপ্তির খাদে এসে মিশেছে যেন সব
তবু উল্টোরথে চলে যায় নিদারুণ সময়।
নৃত্য হিসেবে ভেঁপুতে পালায়
প্রেম ভালোবাসা।
জেগে থাকে খুদার চিৎকার—
পেটে-দেহে-মনে-মগজে খিদা নিয়ে
জমে ওঠে সভ্যতার নাট্যশালা হররোজ।
সন্ধ্যা থেকে ভোর অবধি প্রণয় প্রণতি সংগমে
শূন্যতার এই নির্মাণে ফিরে আসে বারবার মানুষ
ব্যাথা-শোক-কষ্ট ঘষে ঘষে উত্তাপ ছড়ায়
অন্তহীন অঙ্গারসম নাগরিক জীবন।"[৪৮]

মানুষ একদিন নিজের প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধ হয়েছিল। সে প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষার, আত্মসুখ এবং আত্মবিস্তারের। সেই কোন দূর অতীতে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল তা আজ আর নিশ্চিত করে বলা যায় না এবং সেই আদি সমাজের রূপ ঠিক কেমন ছিল তাও নিশ্চিত জানা যায় না। কারণ সেই আদি সমাজরূপ স্থিতিশীল হয়নি। আসলে আমরা জানি— সময় চলমান, সময় ক্রমশ পরিবর্তনের স্রোতে পাল্টে যাচ্ছে দিনকাল। ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবনের ছবি। সেই সাথে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আহার-বিহার, আচার-আচরণ, ভাষা সবকিছুই। দেশে দেশে কালে কালে সমাজ পাল্টাচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনের চিহ্ন সবক্ষেত্রে সমান নয়। কোথাও খুব স্পষ্ট, কোথাও আবার প্রচ্ছন্ন। আসলে বিবর্তন নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনার ওপর। সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে যেমনভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেভাবেই সমাজের মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রবহমান ধারাগুলিও নিজেদের বদলাতে থাকে। এই বদলটি ঘটে অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ায়, ধারাবাহিকভাবে সমাজের নানান সংঘাত-অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, নূতন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার নূতন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিবর্তনের গতিপথ নির্মিত হয়। এ বিবর্তন শুধু সমাজের বহিরাঙ্গিক পরিবর্তন নয়— বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় অবস্থারই ক্রমিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা।

বিবর্তন মানব সভ্যতার প্রবহমান যাত্রাপথের এক একটা বাক্ বা চিহ্নস্বরূপ। সৃষ্টির সেই আদিম লগ্ন থেকে পৃথিবী আপন ছন্দে ক্রমাগত ধারাবাহিক পরিবর্তন-বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে

চলেছে। সেই বিবর্তনের ধারাতেই সৃষ্টি হয়েছে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মরু-প্রান্তর পরিবেষ্টিত শস্য-শ্যামলা ধরণী। সৃষ্টি হয়েছে লীলাচঞ্চল সুবিশাল প্রাণীজগৎ। এসেছে মানুষ। মানুষের প্রজাতি। তার সভ্যতা-সংস্কৃতি। ক্রমাগত পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে, আপস করে আদিম মানুষ বিবর্তিত হয়েছে আধুনিক মানুষে। আদিম সভ্যতা রূপ পেয়েছে আধুনিক মানবসভ্যতায়। সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজস্ব সমাজ, সামাজিক রীতিনীতি। সেদিক থেকে বলা যায়, মানুষের সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির একটা বিশেষ লক্ষণ হ'ল বিবর্তন। বিবর্তন আছে বলেই মানবসভ্যতার ধারা এতো জীবন্ত— এমন প্রবহমান ও উন্নততর। সমাজ-সভ্যতা আপন গতিতে নদীর মতই এগিয়ে চলেছে। সেই চলার একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। নিয়ম আছে। বিবর্তন হ'ল সেই অনিবার্য নিয়ম যা পৃথিবীকে ক্রমশ নতুনত্বের দিকে, সামনের দিকে, আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার ছন্দে রয়েছে জীবনের গতি। প্রাণের স্পন্দন। ক্রমশ নতুন থেকে নতুনতর রূপে সঞ্চরণ। সভ্যতার নতুন নতুন গতিপথে অগ্রগমন। অবশ্য এই অগ্রগমন বা রূপান্তর সবক্ষেত্রেই যে সমান ইতিবাচক ও প্রগতিশীল, একথা বোধহয় জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেক বন্ধুরতা, সংকীর্ণতা, বাধা, ব্যর্থতা রয়েছে পদে পদে। তবে আশার কথা এই যে, মানবসভ্যতার অগ্রগতি কখনো কোনো অবস্থাতেই থেমে থাকেনি। থেমে থাকেও না। বরং এই সভ্যতার ধারা পিছনের ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্রমশ আগামীদিনের ভালো-মন্দ ভাবনায় চালিত হয়। স্বভাবতই পুরনো দিনের তুলনায় আগামী দিনগুলি আরো ভালো, আরো সমৃদ্ধতর হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন নতুনত্ব আসে, তেমনি তৈরি হয় উন্নততর অবস্থা। সেই কারণেই মানুষের ইতিহাস অগ্রগতির ইতিহাস। তা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশে দেশে কালে কালে সমাজ পাল্টাচ্ছে। সমাজ বিবর্তনের রূপ সকল কালে, সকল দেশে এক নয়, দেশকাল ভেদে বিবর্তনের রূপরেখা পৃথক ও তার কারণও বিভিন্ন। সমাজ বিবর্তনের অর্থ সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিবর্তন। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের উপর সমাজজীবন দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলি সমাজকে বিশিষ্ট রূপ দান করে, আর এর থেকে সূচিত হয় পরিবর্তনশীলতার রূপ। বাঙালী মধ্যবিত্ত জাতির উদ্ভব এবং গ্রামজীবন থেকে শহরবাসের রূপ বদলের মধ্যেও আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাঙালী সমাজের মূল কাঠামোটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহিশত্রুর আক্রমণ যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এই বিপ্লব বা আক্রমণ বাঙালীর মর্মমূলে আঘাত করতে পারেনি। অন্তত প্রাক্ ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত সমাজের কাঠামোটি ছিল মোটামুটি

অক্ষুণ্ণ। কারণ সেই সমাজের মর্মমূলে ছিল ধর্মের অধিষ্ঠান।

১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ এবং কূটকৌশলে ইংরেজদের জয় কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা নয়, আমাদের সমাজ জীবনের পক্ষেও এই ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার জীবন থেকে মধ্যযুগের অবসান ঘটেছিল এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই ক্ষণটিকে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> "On the 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began."[৪৯]

এই যুদ্ধের আগে বাংলার সমাজ জীবনের চারটি অঙ্গ ছিল— রাজা বা শাসক ও তার আমলাবর্গ, পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়, বৈশ্য সম্প্রদায় এবং কৃষক। যাকে আমরা বর্তমানে মধ্যবিত্ত বলে অভিহিত করে থাকি, সমাজের সেই অন্যতম বর্গ তখনো অনুপস্থিত। ঠিক করে বললে তখন সমাজ ছিল দুই ভাগে বিভক্ত— উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্ত। পলাশীর যুদ্ধের পরেই পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউ এসে লাগলো বাংলার সমাজ জীবনের তটভূমিতে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা। পাকাপাকিভাবে জমির মালিক হল খাজনা আদায়কারী সম্প্রদায়। জমিদারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেল জমিদারী। এই বন্দোবস্ত থেকে জমিদার, তালুকদার, মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়ও জন্ম নিল এবং তাদের মধ্য থেকে প্রতিভাসম্পন্ন বাঙালী সম্প্রদায় দেখা দিল, আর শহরের বিশিষ্ট নাগরিক এরাই। এইভাবে বাঙালী জীবনে রেনেসাঁস দেখা দিল। রেনেসাঁসের প্রধান পুরোধারূপে সমাজতাত্ত্বিকেরা এই মধ্যবিত্তদেরই নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন—

> ''আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্তৃত্বের ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম? কোন যুগ থেকে সহসা কোন যুগান্তরে এসেছি? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন শিক্ষায়?''[৫০]

ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেই বাঙালী জীবন ও জগৎকে নতুন করে জানলো এবং

প্রবেশ করল আধুনিক যুগে। নবজাগরণের ফলে আধুনিক বাঙালী বিদ্বজনেরা বুঝলো আবেগ নয়, যুক্তিই হল আধুনিকতার আসল কথা। বাঙালী বুঝলো সার্বিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী স্বাধীনতা ও নারী জাগরণের চিন্তাভাবনা। পুরনো মূল্যবোধের পরিবর্তে ঘটল নতুন মূল্যবোধের আগমন। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়—

> ''আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, যদিও তার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা সংস্কৃত চর্চা করতেন, ফারসী চর্চা করতেন, সেইসঙ্গে বাংলা চর্চাও করতেন। বাঙালী কারিগরকে দিয়ে বাংলা হরফও তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলার প্রতি এই মনোযোগ থেকে প্রণীত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। কোম্পানীর আমলাদের ভাষাচর্চা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের মতো ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। তাঁরা হিউমানিস্ট। মানুষ সম্পর্কিত যেকোন ব্যাপারে তাঁদের ঔৎসুক্য। স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদকর্ম সেই ঔৎসুক্যের থেকে সঞ্জাত। ইউমানিস্ট বলেই তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। আর হিউমানিজম তো রেনেসাঁসের সঙ্গে ওতপ্রোত।''[৫১]

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও গঠন আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে ভূমি, বিদ্যা ও বাণিজ্য— এই তিন আশ্রিত, নবগঠিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা ফাঁক নেই। এদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে নতুন সম্প্রদায় দেখা দিল তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পীঠস্থান হল কলকাতা মহানগরী। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বপ্রথম কলকাতাতেই জন্ম নিল— এবং তারপর বাংলাদেশের অন্যত্র তারা প্রভাব বিস্তার করল। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীকে তার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বিশ্বের রাজপথে উপস্থিত করেছিল। এই নবগঠিত সম্প্রদায়ই শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশাত্মবোধের নতুন পাঠ নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনে প্রবৃত্ত হল। মধ্যযুগের গ্রাম্য গৃহমুখী বাঙালী হয়ে উঠল বিশ্বনাগরিক। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে নবরূপে প্রকাশিত হল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, জীবনবোধ সকল ক্ষেত্রেই নবজাগৃতির আলোড়ণ সৃষ্টি করলেন এই মধ্যবিত্ত বাঙালীরাই।

পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে শহরবাসের একটা সাধারণ মনোভাব দেখা দিল। নবগঠিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়, যারা শিক্ষালাভের জন্য প্রথমে শহরে এসেছিল তারা বিভিন্ন কারণে কলকাতা

শহর কিংবা কমপক্ষে মফঃস্বল শহরে বসবাস আরম্ভ করে। নবগঠিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জীবিকা হিসেবে যেসব বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করে সেগুলি হল আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। যদিও চাকুরীর খাতিরে বাঙালী শহরবাসী হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত গ্রামের ভিটার প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ যথেষ্ট ছিল। এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সবকিছুই গ্রামীণ সমাজে সম্পন্ন হত। তখন বছরের অধিকাংশ সময়ই কর্মক্ষেত্রে শহরে কাটালেও অবকাশ যাপনের জন্য গ্রামই ছিল প্রধান স্থান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ শহরবাসীর মধ্যে হ্রাস পাচ্ছিল। গ্রামজীবনের সীমাবদ্ধতা, মন্থরতা, অর্কমণ্যতা, দলাদলির চেয়ে শিক্ষিত মানুষকে শহরের চাকচিক্য, জীবনযাত্রার সুখ সুবিধে ইত্যাদি বেশি আকর্ষণ করছিল। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে তাই দেখা যায় শহর বা নাগরিক জীবন নিয়েই তাঁরা সাহিত্য ভাণ্ডার সাজাচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিও একান্তভাবেই নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত গ্রামজীবনের রূপকার। কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও কোনো কোনো স্থানে গ্রামীণ মানুষের শহরমুখীতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শহরবাস করতে এসে আর গ্রামের ভিটেতে ফিরেনি— এ জাতীয় চিত্র তাঁর রচনায় পাই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাস গ্রামজীবন দিয়ে শুরু হলেও শহরের বর্ণনায় ভরপুর থেকে গেছে। বাংলা ছোটগল্পেও হরেক জীবনের চিত্র বারবার এসেছে। ষাটের দশকের গল্প লিখতে আরম্ভ করা জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবনের যে বৃহত্তর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার স্বরূপ সন্ধান করব।

শহুরে নাগরিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ ব্যস্ততা। মানুষ যেন ছুটছে আর ছুটছে। 'রোদের জন্য' গল্পে গৌরী চরিত্রের মাধ্যমে সেই ব্যস্ততার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন লেখক জীবন সরকার—

> ''সাত-সকালেই হন্তদন্ত হয়ে সোনাদের বাড়িতে। সোনা, বুড়ি আর বুবু তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল— 'বসুন'। বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস ধরিয়ে চা বসিয়ে দিল। গৌরী বলল— 'এখন চা খাব না। এখনি বেরিয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ আছে...।''[৫২]

এই কথাগুলি এমনভাবে হাত-পা নেড়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে বেণী দুলিয়ে বলল যে— যেন, কোনো নাচের মহড়া চলছে।

নাগরিক জীবনে মানুষের অসুখ-বিসুখ হলেই চিকিৎসার জন্য গড়ে উঠেছে রকমারি বেসরকারী চিকিৎসালয় বা নার্সিংহোম। এই নার্সিংহোমগুলোতে রোগী দেখার নাম করে যে ব্যবসা

চলে তার দিকে আঙুল দেখিয়েছেন লেখক। অনেক অনেক টাকার বিনিময়ে সেখানে চিকিৎসাটাই যেন একটা ব্যবসা। তবু শহুরে মানুষ কিছু হলেই নার্সিংহোমেই দৌড়ায়। তাই গল্পে দেখা যায় গৌরী বলেছে— ''অপুর শাশুড়ীকে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলাম 'লাইফ লাইনে'।''[৫৩] গৌরী জানে লাইফ লাইন নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ কতটা 'ডাকাত'। তবুও যেতেই হয়।

নাগরিক জীবনের অতি আধুনিক সত্তায় সামাজিক মূল্যবোধের পরিধি যে কত নীচে নামতে পারে তার সম্যক পরিচয় আছে এই গল্পে— ''ফলে ছেলের সঙ্গে বাপের একটা দূরত্বের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে। এখন তো ছেলে বাপকে তার নাম ধরেই ডাকে।''[৫৪] আসলে বাচ্চাদের সামনে স্বামী-স্ত্রীর সবসময় ঝগড়া, মতের মিল না হওয়া, দুজনেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার দম্ভ এগুলি যেমন কিছু দাম্পত্যে ভাঙ্গন আনে, তেমনি তাদের প্রজন্মকেও ভুল শিক্ষা দেয়—

> ''মনে মনে ভাবি— মাস্টারমশাই গৌরীর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে কেন? কারণটা কী? বিনা কারণে তো এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। তবে কি গৌরী মাস্টার-মশাইকে সুখী করতে পারে না বা মাস্টারমশাই গৌরীকে সুখী করতে পারেন না? গলদটা কোথায়? কোনো গলদ না থাকলে কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। দুজনের মধ্যে যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মাস্টারমশাই কি আড়ালে-আবডালে অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে আছে?''[৫৫]

এরপরেই লেখক নাগরিক দাম্পত্য জীবনের যে মনস্তত্ত্ব নির্ভর ব্যবচ্ছেদ করেছেন তা আমাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়—

> ''গৌরী তার দাম্পত্য-জীবনে এই রোদ-বৃষ্টির খেলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, তা আর হলই না। তাদের দাম্পত্য জীবন যেন একটা নিস্তরঙ্গ নদী। কোনো জোয়ার-ভাটা নেই। এই জীবন যেন দুটো মরা গাছের গুঁড়ি। রাস্তায় বেওয়ারিশ পড়ে রয়েছে। রাত নেই, দিন নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই। আলো নেই, অন্ধকার নেই। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এই কি বাঁচা? এ কেমন বাঁচা?''[৫৬]

নাগরিক জীবনের মহাসমস্যা একাকীত্ব। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের। বয়স্ক মানুষদের একাকীত্বকে জীবন সরকার রূপ দিয়েছেন একজন দক্ষ মনোবিদের মতো—

''জীবনটা এইভাবে গড়াবে ভাবতে পারিনি। শেষ বয়সে এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে কল্পনার বাইরে ছিল। হালকাভাবে অনেকেই বলত কথাটা কিন্তু সেইভাবে ভাবা হয়নি। ভেবেছিলাম জীবন বুঝি এইভাবেই যাবে। দেখা গেল লোকে যা বলত সেই কথাটাই ঠিক।

বয়স বাড়ছে শরীর ভাঙছে। চোখ ঠিক আছে তো দাঁত ঠিক নেই। পেট খারাপ তো মাথায় যন্ত্রণা। হাঁটুতে ব্যাথা, আগের মতো হাঁটতে পারছিনা। নানাবিধ সমস্যা দেহের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। এইসব কষ্ট যে কতদিন চলবে কে জানে। দেহের সঙ্গে মনের একটা সম্পর্ক আছে। শরীর ভালো না থাকলে কোনো কাজকর্মই ভালো লাগে না। কেমন যেন একটা অবসাদ ঘিরে রাখে।

ইচ্ছা থাকলেও সবকিছু ভালো লাগে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আবার ঘরের মধ্যে বসে থাকতেও ভালো লাগে না।

এই যে সমস্যা তা কাউকে বলাও যায় না। নিজেও সহ্য করতে পারি না।"[৫৭]

বয়স্কদের সমস্যা, খিটখিটে স্বভাব, শেষ বয়সে এসে দাম্পত্য নিয়ে হাজারো ঝামেলা বর্তমান নাগরিক জীবনের বহু পরিবারেই ঘটছে। সমাজ সচেতন লেখক জীবন সরকার তাঁর 'ফালতু' গল্পে এই সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন—

> ''ললিতা ফোঁস করে উঠল— আমি থাকলে কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে?
>
> —অসুবিধা কেন? এইভাবে কথা বলছ কেন? তোমার কী হয়েছে বলত। আগে তো কখনো এইভাবে কথা বলতে না।
>
> —কোথাও গেলে তো খোঁজ নিতে না। ইদানীং দেখছি নিচ্ছ।
>
> —কেন আমি নিতে পারি না?
>
> —পারবে না কেন? নতুন দেখছি। তুমি খেয়াল রাখছ। কোথায় যাই না যাই।
>
> — আমার তো অধিকার আছে।
>
> —ললিতা বাঁকা চোখে হাসল। তার মনে কোথাও একটা গলদ আছে।
>
> —আমি আর কিছু না বলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।"[৫৮]

গল্পকথক একজন বৃদ্ধ। তিনি পুরনো দিনের স্মৃতির অ্যালবাম বের করেছেন। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল তার ললিতার সঙ্গে। এই ললিতা কলেজে পড়ার সময় এক দণ্ডও তাকে চোখের বাইরে যেতে দিতে চাইতো না। বিয়ের পরেও ভালোভাবে প্রেমপ্রীতি নিয়ে কাটিয়েছেন বহু বছর। এখন বৃদ্ধ বয়সে এসে এই খিটখিটে মেজাজ, সব সময় ঝগড়া চলছেই। গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন, হয়তো দু'জনের মনের ভেতরেই কিছু ফাঁক থেকে গেছে, যা এতদিন প্রকাশ্যে আসেনি— সে টাকা-পয়সার অভাবই হোক, কিংবা ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভাবনা অথবা অন্য কিছু। এখন এই বয়সটা সেই ফাঁককে হাটখোলার মতো উন্মোচন করে দিয়েছে। তাই এত বিরোধ ও সমস্যা।

বিয়ের পর অনেক ছেলেই বাবা-মাকে দেখে না, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

বাবা-মায়ের স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে। সমাজের এই অধঃপতনের দিকটিকেও জীবন সরকার এঁকেছেন মানুষের মূল্যবোধ ফেরাতে। 'শেষ স্টেশন' গল্পে তাই লেখকের কলম যেন চাবুক হয়ে যায়—

> ''ওরা ভেবেছে মা যত তাড়াতাড়ি এই বাড়ি থেকে চলে যায়, সেটাই মঙ্গল। ওরা ধরে নিয়েছে যা কিছু মা করেছে সবই ছেলেদের জন্য। মা কি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? অর্থের জন্যেই যতসব ঝামেলা। মনে হয়, এখনি মাকে তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিয়ে সব কিছু দখল করবে। বড়ো ছেলেরে বউ তো ইতিমধ্যে অনেক কিছু সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই ছেলেকেই পেটে রেখেছেন দশ মাস। ওরা ভাবেনা সেই কথা। এখন বউ-ই সব। বউ যা বলে তাই শোনে। বউটা কুচক্রী। হিংসুটে। ও সব সময় ভাবে ছোট ছেলেকে বেশি টাকা দিচ্ছে। ওদের মধ্যে আর কিছু অশান্তি নেই, এই নিয়েই যত গণ্ডগোল। এই নিয়ে দুই ছেলের মধ্যে একটা দেওয়াল গড়ে উঠেছে। এই দেওয়াল কিছুতেই সরানো যাবে না।''[৫৯]

একজন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবন সরকার এই ঘুণেধরা সমাজটার ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তাঁর মতে, ছেলেদের চেয়েও বাবা-মাকে নিয়ে এখন বেশি চিন্তা করে মেয়েরা। গল্পে এই বৃদ্ধা মায়ের দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের নাম প্রিয়া। কেন্দ্রিয় সরকারী দপ্তরে চাকরি পেয়ে দেরাদুন চলে গেছে সে। বৃদ্ধা মা প্রিয়াকে অনেক বুঝিয়েছে, নিজের দেখাশোনা মত একটা ছেলে দেখে বিয়ে করে নিতে। কিন্তু প্রিয়া রাজি হয়নি—

> ''বলেছে তুমি আমাকে আর যাই বল বিয়ে করতে বোলো না। দাদারা বিয়ে করে যে যার বউ নিয়ে চলে গেল। আমি তোমাকে একা ফেলে কোথাও যাব না। শেষ বয়সে তোমাকে দেখবে কে?''[৬০]

বৃদ্ধা মা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন মেয়ের কথা শুনে। পুরুষ হয়েও গর্ভজাত ছেলেরা যা করতে পারেনি একজন মেয়ে হয়ে প্রিয়া স্বাড়ম্বরে সে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। প্রিয়া দেরাদুন থেকে বৃদ্ধা মাকে সাহস জুগিয়ে সবসময় চিঠি লেখে—

> ''মা, তুমি চিন্তা কোরো না। কলকাতায় আসার চেষ্টা করছি। মনে হয়, হয়ে যাবে। দাদারা চলে গেছে তো কী হয়েছে। আমি তোমার কাছে থাকব।''[৬১]

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে খানখান। এখন বাবা-মাকেও বাদ দিচ্ছে ছেলেরা। তাহলে পরিবার বলে কি আর কিছু থাকবে— লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। দিন দিন পরিবারগুলি ভাঙছে। ভাই-ভাইকে দেখছে না। বোন-ভাইকে দেখছে না। দিন দিন সবকিছুই পাল্টে যাচ্ছে। এই হাওয়া

বিষাক্ত হাওয়া।

'বাস ছাড়লে বৃষ্টি নামে' গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নগর জীবনের অন্যতম সমস্যা প্রেমের ব্যর্থতা নিয়ে। নারী পুরুষ এখন বিয়ের আগেও যেমন প্রেমে লিপ্ত হয়, তেমনি বিয়ের পরেও বিবাহ-বহির্ভুত প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। 'বাস ছাড়লে বৃষ্টি নামে' গল্পে তাই প্রেমিকার কান্না—

> ''তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে কেন? আপনজনকে কি কখনো এভাবে ছেড়ে দিতে হয়? তুমি ভীষণ বোকা, আর ভীষণ ভীতু। তুমি আমার কথাটা ভাবলে না। জানো, তোমার জন্য আমি কত কষ্ট পেয়েছি। জীবন আমার যন্ত্রণায় কাটছে। স্বামীর ঘর করছি ঠিকই, কিন্তু সে সবকিছুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।''[৬২]

রানী নামের মধ্য বয়সী এক রমণী এই গল্পের নায়িকা। বহুদিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া প্রাক্তন প্রেমিককে দেখেই রানী তার মনের সব যন্ত্রণা উগলে দিয়েছে। কতটা যন্ত্রণাকাতর হলে সে বলতে পারে—

> ''আমার স্বামীকে আমি পছন্দ করি না। মনের দিক থেকে তাকে আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিনই মেনে নিতে পারিনি।''[৬৩]

তার আরো আক্ষেপ— সাজানো বাড়ি, সাজানো ঘর, ছোট্ট সংসার। কি নেই? সব কিছু আছে—

> ''কিন্তু এই সব থেকেও আমি আলাদা। আমি থেকেও নেই। শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। এখন আমি মৃত্যুর অপেক্ষায়।''[৬৪]

লেখক বিশ্বাস করেন বিবাহ-ই জীবনের শেষ কথা নয়। বিবাহ করেও ভালোবাসা যায়, না করেও ভালোবাসা যায়, যদি সে ভালোবাসা চিরন্তন হয়—

> ''না। তুমি ভালো থেকো। সবাইকে ভালো রেখো। এটাই আমার একমাত্র চাওয়া?— তুমি হারিয়ে গেলে, আমি বাঁচব কী করে? কী নিয়েই বা বাঁচব? তুমি আর— এই জন্যই আমি বেঁচে আছি। সেইটাই তো আমার প্রেরণা। তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করছ। আমার চোখের জলে তোমার হৃদয়ে আমার নাম লেখা আছে। আমি তো তোমাকে এখনো আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় রেখে দিয়েছি। সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি। কাউকেই বলিনি। কেউ জানেওনা সে কথা। ভবিষ্যতেও কেউ তা জানবে না। সেই স্বপ্ন নিয়েই আমার জীবনের শেষ ক'টা দিন আমি বেঁচে থাকব। আর কী? আমি তো জানি— তুমি আমাকে ভালোবাসো। আর তুমিও তো জানো— আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের এই ভালোবাসা চিরন্তন। মাঝখানে একটা দেওয়াল তোলা

থাকলেও আমাদের মনকে তো আর এই দেওয়াল দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না। বাঁধতে পারবেও না কেউ। সব বাঁধা যায়, কিন্তু মনকে তো বাঁধা যায় না। আমরা এইভাবেই পৌঁছে যাবো শেষ টার্মিনাস। আর এইভাবেই বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব।"[৬৫]

নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতায় জীবন অতিষ্ট হয়ে মানুষ যখন নিস্তার খোঁজে তখন আবার ফিরে যেতে চায় গ্রামজীবনে। মনে পড়ে যায় বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন কীটসের "To one to who has been long in city pent"-এর কবিতার কথা—

"To one who has been long in city pent,
Tis very sweet to look into the fair
And open face of haven,_ to breathe a prayer
Full in the smile of the blue firmoment.
Who is more happy, when, with hear's content,
Fatigued he sinks into some pleasant lair
Of wavy grass, and reads a debonair
And gentle tale of love and languishment?
Returning home at evening, with an ear
Catehing the notes of Philomel, an eye
Watching the sailing cloudlet's bright career,
He moorns that day so soon has gluded by;
E'en like the passage of an angel's tear
That falls through the clear either silently."

নাগরিক জীবনে বাধ্য হয়ে বাস করতে হওয়া জীবন সরকারও মুক্তির পথ খুঁজতেন। নিজের আত্মকথায় বারবার বলেছেন, সাওয়ারের নিচে স্নানের চেয়ে তাঁর বেশি ভালো লাগে ধলেশ্বরী নদীতে ডুব। গল্পের মধ্যেও তিনি নাগরিক জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। 'নদীর মত' গল্পে নায়কের প্রেমপত্রে সে অভিলাষ অসাধারণ ব্যঞ্জনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে—

"পাপিয়া, আমার সোনা পাপিয়া। জানি, তুমি আমার এই চিঠি পেয়ে হাসবে। কিন্তু কী জানো, চিঠি দেওয়া ছাড়া আমার কাছে আর অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিল না? আমি পরাজিত। পরিশ্রান্ত। আমার সামনে কোনো নদী দেখতে পাচ্ছি না যে

স্নান করবো। কিংবা রঙিন নৌকা নিয়ে দূরদেশে চলে যাব। অথবা ভাটিয়ালি গান গেয়ে সময় কাটিয়ে দেব। আমার কোনো ফসলেরই জমি নেই। অথচ আমার ইচ্ছা লাঙল দিয়ে চাষ করি। সোনালি ধান লাগাই। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। আমি যেন ক্রমশ ড্রেনের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে গলা টিপে মারতে চাইছে। আমি তাকে বাধা দিতে পারছি না।''[৬৬]

নাগরিক জীবনের ভোগবাদী মানুষের জীবনচর্যা নিয়ে প্রচুর লেখকের প্রচুর গল্প আছে। নগরবাসীর বিলাসিতা, উশৃঙ্খল জীবনযাপন, মদ্যপান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নগরের ফুটপাতবাসীরাও যে নগর জীবনের একটা অংশ, এদের কষ্টভরা জীবন নিয়ে খুব কম লেখকই গল্প লিখেছেন। জীবন সরকারের কলমের কালি ফুটপাতবাসীর চোখের জল থেকে সঞ্জীবনী সুধা নিয়েছে। 'নদীর মতন' গল্পে হেরলডরা এর উদাহরণ। পায়ে পায়ে রাস্তা ডিঙ্গাচ্ছে মানুষ। চারপাশে কথার পর কথা সাজিয়ে নদী-সমুদ্র হচ্ছে। হেরলডের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। নিজের মনে কাজ করছে— ''কাজ না ছাই। দুনিয়ার নরক ঘাঁটা। কী আর করবে। পেটের দায়ে সবকিছু করতে হয়।''[৬৭]

ছোটো থেকেই হেরলড জেনে এসেছে ফুটপাত ওর ঘর। ফুটপাতই ওর সবকিছু। আশোপাশে ওর মতো যারা আছে ওদের মুখেই শুনেছে ওর নাম হেরলড। নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে আর কিছুই জানে না। কে নাম রেখেছে তাও জানে না। তার সামনের ওই চার্চটার কেউ হয়তো রাখতে পারে। নিজের সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু আর জানে না সে।

জানবার কৌতূহল হয়েও জানতে পারেনি। হেরলড অ্যান্টোনি মার্কেটের সামনেই থাকে। ওখানেই স্নান, খাওয়া, রাতে শোয়া। ইন্টালি মার্কেটের ভিতরেই— ''স্নান করার জায়গা-পায়খানা।''[৬৮] ভাতের হোটেল, রুটি সবকিছু পাওয়া যায়। ফুটপাতে শুধু হেরলড একা নয়, আরো অনেকেই থাকে। এদের কষ্টভরা চিত্র লেখক দক্ষতার সাথে তুলে এনেছেন। শহুরে মানুষ বলতে আমরা বুঝি শুধুমাত্র কোর্টপ্যান্ট পরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চলাফেরা করা বাবুদের। অথচ যে রিক্সাচালক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, হোটেলের ছোট্ট যে ছেলেটি উচ্ছিষ্ট থালা বাসন মাজছে, যে বৃদ্ধ লোকটি বাবুদের জুতা পালিশ করে দিচ্ছে, তারাও যে বৃহত্তর নগর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবন সরকার তাঁর গল্পে তার রূপ দিয়েছেন।

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ঠক ও জচ্চুরি নিয়ে লেখা গল্প 'ভিতরে বাইরে ঝড়'। মানুষের মনে যে কত জটিল ঘুর্ণাবর্ত কাজ করে এবং সেখানে কত দুরভিসন্ধি খেলা করে এই গল্প পড়লে তা

বোঝা যায়। গল্পে গীতার মা গীতার জন্য বহু দিন ধরেই বিবাহের পাত্র খুঁজছিল। যেমন তেমন পাত্র নয়— সরকারি চাকরি করা পাত্র। পেয়েও গেল। রেলের চাকরি করা পাত্র। মা-মেয়ের উদ্দেশ্য ছিল কোনোমতে বিয়েটা দিতে পারলেই স্বামীকে হত্যা কিংবা তা না হলে তাকে পাগল প্রতিপন্ন করে স্বামীর চাকরিটায় নিজে ঢোকা— ''গীতার মনে তো একটাই ধান্দা। কি করে চাকরিটা আদায় করা।''[৬৯] স্বামীর দিকে একেবারেও তাকিয়ে দেখেননি। একসঙ্গে থাকতেই চায়নি। স্বামীর কোয়ার্টারে স্বামী। গীতা তো মায়ের সঙ্গে। এইভাবেই চলছিল। একদিন দেখা গেল অবিনাশ দৌড়াচ্ছে। গীতার স্বামীর নাম অবিনাশ। পিছনে গীতা ও গীতার মা। গীতার মা চিৎকার করে বলছে—

> ''আমার মেয়েকে মেরে ফেলল, আমার কী সর্বনাশ হল। পাগলটার হাতে পড়ে আমার মেয়ের জীবন যায়।''[৭০]

আসলে ঘটনাটা ছিল পরিকল্পিত। তখন শীতকাল চলছিল। গীতা অবিনাশকে স্নান করতে বলেছিল। অবিনাশ স্নান করবে না। গীতার মা আর গীতা দু'জনে মিলে ঐ শীতের মধ্যে অবিনাশের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। অবিনাশ আর কি করে। দে ছুট। পিছু পিছু গীতাও দৌড়। খুব হতভম্ব লাগছে অবিনাশকে। জলে জলে জামা ভেজা। মাথায় জল গড়াচ্ছে আর কাঁপছে। আশপাশের কোয়ার্টারের লোকজন এই দৃশ্য দেখে খুব মজা পেল। কেউ কেউ বলল মাথাটা একদম গেছে। এবার পাগলা গারদে পাঠাতেই হবে।

গীতা আর গীতার মায়ের ষড়যন্ত্র সার্থকভাবেই সাফল্য পেল। সকলের সামনে প্রতিপন্ন করা গেল অবিনাশ পাগল। ''গীতার মায়ের আনন্দ আর ধরে না। যা যা ভেবেছিল ঠিক ঠিক সেভাবেই হল।''[৭১] আসলে মানুষ যখন পশু হয়ে যায় তখন তার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। বাইরের লোক যাতে বুঝতে না পারে তাই বাইরের লোকের কাছে সবসময় মায়াকান্না কাঁদত—

> ''আমার গীতার কী হল। ভগবান আমাকে কী শাস্তি দিল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। একি ভুল করল। মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে গেল।''[৭২]

এদিকে গীতা প্রায়ই স্টেশনে রেলের অফিসে যায়। কথাবার্তা বলে। অফিসের লোকদের সহযোগিতায় গীতাও চাকরি পেয়ে যায়—

> ''গীতা যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। মেঘ না চাইতেই হাতের কাছে জল। চলে এল সব। গীতাও পাস করা ছিল, ফলে চাকরি পেতে কোনো অসুবিধাই হল না।''[৭৩]

এ গল্প আসলে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মানসিকতার কলঙ্কময় রূপ। মধ্যবিত্ত জীবনটাই আসলে বিচিত্রতায় ভরা। জীবনের বহু বিচিত্র রূপ এখানে প্রতিফলিত। সেই বহুরূপী জীবনের

একাংশ, মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা— যা আধুনিক কালের প্রায় স্বধর্ম হয়ে উঠেছে। জীবন যেখানে অভাবে, হতাশায় ও ব্যর্থতায় বিকৃত, কদর্য-সেখানে জীবনের মুখোমুখি হয়ে তার সেই বিকৃতি ও কদর্যতাকে মোহমুক্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন লেখক জীবন সরকার। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা ব্যাপক, মানুষের সঙ্গে ব্যাপক মেশামেশি করে অর্জন করেছেন মানব মনের, জীবনের নানা দুর্জ্ঞেয় রহস্য কথা। জীবনের বিভিন্নদিক, জীবনের অন্ধকারময় দিক— অন্যায়, অপরাধ, বঞ্চনা ও খর্বতার নানা রূপ এবং মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতা জীবন সরকারের অন্তর্মুখী মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের এই জটিল মানসিকতার ভিত্তিমূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে এক ধরনের প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় আর নিজেকে বিপন্ন করার এক নিদারুণ মানস প্রবণতা। আর জীবন সম্পর্কে মধ্যবিত্তের এই জটিল মানসিক বিন্যাসে কোন সংবেদনশীল মানুষই সুখী হতে পারে না। তাই কখনো কখনো মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভপ্রয়াস শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়ে যায়। আর তারফলেই সেইসব মানুষের জীবনকথায় অন্যায়-অপরাধ-ষড়যন্ত্র ইত্যাদির সুর ফল্গুধারার মত এমনভাবে প্রবাহিত হয়, যাতে জীবনের সহজ-স্ফুর্তি বা প্রাত্যহিক জীবনের আশা-আলো- আনন্দের প্রছন্ন ছবি তাতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মানুষকে আমরা সংসারে কখনো ভালো বা মন্দ, পাপী বা পুণ্যবাণ— বিভিন্ন রূপে দেখি, সেটা প্রধানত তার পার্শ্ববর্তী সময়-পরিবেশ-পরিস্থিতি বা মনের জটিল ভাবনা বিন্যাসের কারণেও হয়। এই গল্পে গীতা ও তার মায়ের কদর্যতাও এর ফলেই হয়েছে। গল্পকার জীবন সরকার নিখুঁতভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাগরিক জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা বৃদ্ধ বয়সে একাকীত্ব। ছেলে-মেয়ে বিদেশে থাকে, কিংবা বউ নিয়ে ছেলে পৃথক হয়ে গেছে। বাবা মায়ের খোঁজ রাখে না, টেলিফোনও করে না। কবিতা দিয়ে বললে বলা যায়—

‘‘এবার পুজোয় কি আসবি তুই, শঙ্খনীল ?
শরতের আকাশে সাদামেঘ দেখলেই
চোখের নীচটা ভিজে ওঠে,
প্রতীক্ষারা গলার নীচে কেমন যেন
আদর জড়িয়ে থাকতে চায়।
প্রথম প্রথম খুচরো খোঁজখবর রাখলেও
কমতে কমতে এখন একদম রাখিস না।
শঙ্খনীল—

ফোনটা বেজে উঠলেই বুকটা ধড়পড় করে ওঠে।

মনে হয়, তোর ফোন এল বুঝি...'' (স্বরচিত)

এই সমস্যাগুলি এখন নাগরিক জীবনে উত্তরোত্তর বাড়ছে। আসলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাঙ্গনের পর মানুষ এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিশ্বাসী। জীবন সরকারের 'আকাশের দিকে' গল্পে আমরা দেখি স্মিতা আর তার স্বামী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তাদের ছেলে-মেয়ে বিদেশে থাকে। খোঁজ নেয় না একদম। ফলে একাকীত্বভরা জীবন। ''কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছি মাঝে মধ্যেই স্মিতা চুপচাপ হয়ে যায়। এই ছেলের কথা ভাবে বুঝি।''[৭৪] বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল ওদের টেলিফোন আসেনি। ওদের হাতে সময় নেই, ওরা যেন ছুটছে। তাই বৃদ্ধ বয়সের কান্না—

''ঘরে দুজন প্রাণী।

একজন যদি কথা না বলে, কেমন লাগে।

স্মিতা চুপ হয়ে থাকলে আমার মুশকিল। স্মিতা দিন দিন কেমন যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে।''[৭৫] চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় তার স্বামী। ডাক্তার এবং রোগীর কথোপকথনে আজকের নাগরিক জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র ধরা পড়ে—

''ডাক্তারকে থামিয়ে বললাম: আমার তো ভালো লাগছে না। ঘরে দু'জন প্রাণী— ছেলে, ছেলের বউ আমেরিকায়। ইচ্ছে হলে ফোন করে। ব্যাস। ওই পর্যন্তই। আমি বাবা চুপচাপ থাকতে পারি না। খারাপ লাগে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলব, এখন আর আত্মীয়স্বজনরাও আসে না। ফোনেই কাজ সেরে নেয়। আসা-যাওয়ার সময় কই।

কিন্তু ডাক্তার উত্তর দিল, সব কিছু মানিয়ে নিতে হবে। যখন যেমন, সময়ের সঙ্গে তাল না মেলাতে পারলেই কষ্ট হবে। বুঝলেন কিছু?

আমার বউ তো ঘরেই থাকে না। কখন বের হয়, কখন ফিরে আসে নিজেই জানি না। নিজেরটা ভাবলে চলবে? ঘরে ঘরে যন্ত্রণা। ওসব নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। ভালো থাকবেন।

— যাই।''[৭৬]

আসলে এই একাকীত্ব আজকের প্রৌঢ় প্রৌঢ়াদের বিরাট সমস্যা। গল্পে তাই দেখা যায়, স্মিতা কাজ ফেলে হঠাৎ জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ''আকাশে যে কি দেখে কে জানে।''[৭৭] নিজের মৃত্যু— না অন্য কিছু? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন গল্পের নায়ক এই

গল্পে। আসলে মধ্যবিত্তের এই জটিল মানসিকতার ভিত্তিমূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে এক ধরনের প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়। আর নিজেকে বিপন্ন করার এক নিদারুণ মানস প্রবণতা। জীবন সম্পর্কে মধ্যবিত্তের এই জটিল মানসিক বিন্যাসে কোনো সংবেদনশীল মানুষই যে সুখী হতে পারে না, গল্পকার তা দেখতে চেয়েছেন। স্মিতা জীবনের অনেক ওঠানামা দেখেছে। ছেলে মেয়ে বিদেশে আমেরিকায় থাকে, স্মিতা এবং তার স্বামী দুজনেই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, সব সত্য— কিন্তু কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির হাহাকার ছিল। আজ হাটখোলার মত তা খুলে গেছে। আসলে কখনো কখনো মানুষের জীবনব্যাপি সকল শুভপ্রয়াস শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়ে যায়। আর তার ফলেই সেইসব মানুষের জীবনের কথায় তথা গল্পে হতাশা, বিষণ্ণতা বা বিচ্ছিন্নতার সুর ফল্গুধারার মতো এমনভাবে প্রবাহিত হয়, যাতে তার জীবন সহজমূর্তি বা প্রাত্যহিক জীবনের আশা-আলো-আনন্দের প্রচ্ছন্ন ছবি তাতে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ তার অন্তর্নিহিত মানবসত্ত্বাকে প্রকাশ করতে চায়, নিজের মুক্তি খোঁজে। নির্বাক আকাশেও স্মিতা অনেক কিছু দেখে, বোঝে, ধরতে চায়। মনের আকাশ আর মাথার ওপর আকাশটা এক হয়ে যায় তখন।

নাগরিক জীবনের বয়স্কদের সমস্যা নিয়ে আরেক একটি গল্প 'সম্পর্ক'। গল্পটা শুরু হয়েছে একটা চমক দিয়ে— ''ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনালেও আসলে কথাটা সত্যি। সৌম্যকান্ত শেষবয়সী ভদ্রলোকের অবসর সময় কাটাবার জন্য লোক চাই।''[৭৮] সময় কাটানোর জন্য অরূপরতনবাবু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তার সঙ্গে গল্প করার জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী যুবতী একজন মেয়ে চাই। আর এই সূত্রেই কাজের জন্য নিয়োজিত হয় অলকা নামের মেয়েটি। অলকা গ্রামজীবনের গল্প করলে অরূপরতনবাবু চেঁচিয়ে উঠেন। তিনি রেগে গিয়ে বলেন, দুঃখ, কান্না, গরিবী, অভাব-অনটন এইসব নিয়ে গল্প তিনি শুনতে চান না। তিনি ভোগের গল্প শুনতে চান, ঐশ্বর্যের গল্প শুনতে চান। অলকা স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভদ্রলোক এত বিলাসিতার মধ্যে বাস করছেন তবু তিনি বড়োলোকদের গল্প শুনতে চান। আশ্চর্য! আসলে—

''ন জাতু কাম: কামানং উপভোগেন শ্যামতি।
হবিষ কৃষ্ণ বত্নেবি ভূয়া এবহি বর্দ্ধতে।''[৭৯]

নাগরিক জীবনের কিছু মানুষ ভোগ-বিলাসে থাকতে থাকতে যে মন-মেধা, মগজকেও ভোগী করে তোলে এই গল্প তার উদাহরণ। আসলে জীবনের রূপ বহুবিচিত্র। সেই বহুরূপী জীবনের একাংশ, মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যা আধুনিক কালে প্রায় সধর্ম হয়ে উঠেছে। জীবন যেখানে অভাবে সেটা আর্থিক হতে পারে কিংবা নৈতিক, হতাশায় ও ব্যর্থতায় বিকৃত কদর্য সেখানে

জীবনের মুখোমুখি হয়ে তার সেই বিকৃতি ও কদর্যতাকে মোহমুক্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করেছেন লেখক। সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, সুখী লোকেরা অলীক কল্পনা করে না। অসুখী লোকেরা অলীক কল্পনা করে থাকে। এইরূপ অলীক কল্পনা করার পিছনে থাকে অতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কল্পনা সৃষ্টিকারী এই কামনা নির্ভর করে ব্যক্তির চরিত্র ও পরিবেশের ওপর। ড. প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> ''সাধারণত লক্ষ্য করা যায় এ ধরনের কল্পনা দু-প্রকারের হয়। এক, ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত অথবা কামভাবযুক্ত কল্পনা। একজন যুবতীর ক্ষেত্রে প্রায় সব সময়ই এই আকাঙ্ক্ষা কামভাবনাকে ভিত্তি করে দেখা দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কামভাবের বিরোধী বলে ধরা ঠিক হবে না, বরঞ্চ বলা চলে এরা প্রায় একত্রিতভাবে দেখা যায়।''[৮০]

গল্পের অরূপ রতনবাবু এই জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত।

কলকাতার নগরজীবন ফুটপাতবাসীর কান্না নিয়ে লিখিত গল্প 'সেজানের দিনরাত্রি'। গল্পের নায়ক সেজান নামে এক কিশোর পদ্মপুকুরের পিছনে যেখানে কিস্টফোর রোড আরম্ভ হয়েছে সেখানে এক আস্তাবলে সেজান থাকে। নগর কলকাতার বিবরণ সেজানের কথায় পাওয়া যায়। কলকাতায় এখনো দু-একটা আস্তাবল আছে। রাজাবাজার-এন্টালির ফুলবাগানে কিংবা কলুটোলায়। কলকাতার রাস্তায় এখনো ফিটন গাড়ি দেখা যায়। ঐ গাড়িগুলি আস্তাবলে এলে সেজানের ডাক পড়ে। গাড়িগুলো মেরামত করা থেকে রং করা, ঘোড়ার খুরে লোহা দাগানো সব কিছুতেই দক্ষ সেজান। এমনকি কোনো ঘোড়া যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে সে চিকিৎসাও সেজানই করে থাকে। ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ না থাকলে বাকি সময় কাটে ঘুড়ি উড়ানোর পিছনে। ঘুড়ি বানানোও সেজানের কাজ। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় সে যায়। শহর কলকাতার বাবুরা তাকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। সেজান ফুটপাতে একাই থাকে। ''ঘুমাতে একটু রাত হয়। রাত হলে আমার আবার বোতল না হলে চলে না।''[৮১] কিশোর বয়সে মদকাশক্তির করালগ্রাস কতটা সর্বনাশের সেজানের স্বীকারোক্তি তার প্রমাণ। আসলে সেজানের মতো ফুটপাতবাসীর জীবনটাই যেন গোলকধাঁধা। সেজান জানে না, তার জন্ম কোথায়। ''কোথায় আমার দেশ, কি ধর্ম— কিছু জানে না, নিজের বাবা মাকে জানে না।''[৮২] নগর জীবনের ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত নরনারীর অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে কত হাজার হাজার শিশু পৃথিবীতে আসছে। পূর্ণতা লাভের আগেই গর্ভপাত করিয়ে এদের মেরে ফেলা হয়। কিংবা ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায় অথবা ফুটপাতে। অধিকাংশই মরে যায়। যারা বেঁচে যায় তাদের

অবস্থা হয় সেজানের মতোই। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন বিভীষিকাপূর্ণ জীবন।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সেজান আস্তাবলের সামনে দাঁড়ায়। তার জীবনের সঙ্গে সে মিল খুঁজে পায় শহরটার। সেও একাকী মধ্যরাতের নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা শহরটার মতো। আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর দিকে তাকায় সেজান। ঘোড়াগুলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। চোখ কোটারগত। যা খেতে দেয় মালিক, তাতে ওদের পেট ভরে না। আর মালিক খেতে দিবেইবা কোথা থেকে। ঘাসের অনেক দাম হয়ে গেছে। তাছাড়া ঘোড়ার গাড়িতে কলকাতার বাবুরা এখন ওঠেনই না। সেজানের আক্ষেপ—আগে বাবুরা ফিটন গাড়িতে করে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে যেত এখন আর যায় না। শৌখিন বাবুরা কলকাতা শহরে হারিয়ে যাচ্ছে। আস্তাবলে মিনা নামের ঘোড়াটাকে খুব ভালোবাসে সেজান। মিনা আর কিছুদিনের মধ্যেই আরেকটা ঘোড়ার জন্ম দেবে। সেজানের খুব ইচ্ছে, মিনার বাচ্চা হলে সে তাকে বিক্রি হতে দেবে না, বড়ো করে রেসের মাঠে লাগাবে। কয়েক সপ্তাহ পরেই মিনা ঘোড়ার প্রসব হয়। সেজানের খুব আনন্দ— ''বাচ্চাটা যেন আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ''[৮৩]

বাচ্চা ঘোড়ার নাম সে রাখলো টারজান। ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল ঘোড়াটা। সেজান টারজানকে নিয়ে খেলা করে, তার জন্য ভালো ঘাস কিনে আনে। ''ওকে ছাড়া আমি এক মিনিটও থাকতে পারি না। ও যে আমার চোখের মনি।''[৮৪] সেজান ঠিক করে নেয়, টারজানকে সে আস্তাবলে রাখবে না। কারণ ছোট বয়সেই মালিক ওকে ঘোড়ার গাড়িতেই লাগিয়ে দিবে। একদিন রাতে আস্তাবলে গিয়ে সেজান দেখে টারজান নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও টারজানকে পাওয়া গেল না। নিজের জীবনের বেদনাকে টারজানের সঙ্গে তুলনা করে সেজানের উপলব্ধি—

> ''আমি সেজান। আমার সবকিছু হারিয়ে গেল। আমার আর কেউ রইল না এই পৃথিবীতে। আমি আবার ঘর ছাড়া। এই আস্তাবলে আমি আর থাকব না। চলে যাব নতুন রাস্তা ধরে।''[৮৫]

সেজানকেও একদিন ফুটপাতে রেখে গিয়েছিল কেউ। ঘোড়াদের যেমন বংশ পরিচয় থাকে না, টারজান যেমন 'রুটহীন এক অপরিচিত' বংশজাত, ''আমিও ঠিক তেমনি।'' সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এই গল্প সম্পর্কে লিখেছেন—

> ''কলকাতায় ক্ষীয়মান ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবলে সেজান কাজ করে। আস্তাবল পরিষ্কার করা, ঘোড়াদের তদ্বির করা, খাওয়ানো, চিকিৎসা করা— সবই তার কাজ। সেজানের দুটি শখ— ঘুড়ি ওড়ানো আর মাউথ অর্গান। জন্মগোত্র, পিতামাতা— কিছুই তার জানা নাই। সেজানের অবহেলিত জীবনের সঙ্গে মিল আছে অবহেলিত

ঘোড়াগুলির। আস্তাবলের একটি মাদি ঘোড়ার বাচ্চা হবে। তাকে অভিজাত বংশের ঘোড়া— রেসের ঘোড়া হিসাবে তৈরী করতে চায় সেজান। সে সুযোগ কি আস্তাবলের মালিক আফজল মিঞা দেবে? আফজল মিঞা নির্মম। গাড়ি টানতে অক্ষম ঘোড়াকে নির্মম চাবুক মারে। সেজান একথা জেনে দুঃখিত হয়। গর্ভবতী মিনার বাচ্চা হয়— সেজান নাম রাখে টারজান। তার স্বপ্ন তাকে পালবে, পুষবে, রেসের ঘোড়া করে তুলবে। কিন্তু আফজল হঠাৎ একদিন টারজানকে বিক্রি করে দিল। টারজান নামে নামগোত্রহীন এই ঘোড়া হারিয়ে গেল। সেজানের মনে হল, সেও একদিন হারিয়ে যাবে। এসব ঘোড়ার বংশ পরিচয় থাকে না। সেজানেরও নেই। সেজানের স্বপ্ন এভাবেই ভেঙ্গে যায়। শিকড়হীন সত্তাহীন এক মানুষ সেজান- সে যেন এক কয়েদী, যে স্বপ্ন দেখে মুক্তির, কিন্তু মুক্তি পায় না। এক হতভাগ্য গরীব যুবক সেজান আস্তাবলের ঘোড়াদের প্রতি মমত্ব, সেই সঙ্গে একাত্মবোধ করে। 'সেজানের দিনরাত্রি' অবশ্য স্মর্তব্য গল্প।"[৮৬]

যুগ ভাঙ্গে, যুগ গড়ে। সময়ের বহমানতাকে স্বীকার করে কাল এগিয়ে চলে অন্তহীনভাবে। সেই সঙ্গে চলতে চায় জীবনও। সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে যাপিত জীবনের পরিচিত ছক তছনছ হয়ে গেলে মানুষ কেমন হয়ে যায়, কেমন অসহায় হয়ে যায়, কেমন সংকটে পড়ে তারই বহুমাত্রিক রূপ লক্ষ করা যায় জীবন সরকারের ছোটগল্পে। এই সংকট থেকে সাধারণ মানুষের জীবন নির্মল করে তোলা আজ বড়োই কঠিন। কেননা মানুষ আজ তার কৃতকর্মকে নির্দিধায় স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছে। এখানেই জীবন সরকার প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামজীবনের সাথে নাগরিক জীবনের রূপ বর্ণনা করে।

বাংলার গ্রাম, শহর, শহরতলীর মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের পট পরিবর্তন, নানাবিধ সমস্যা সংকটের রূপ লক্ষ্য করা যায় জীবন সরকারের ছোটগল্পে। গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবন দুটোই তাঁর লেখাতে এমন ভাবে এসেছে, এখানে তিনি ভাবতে বাধ্য করেছেন, আর্থ সামাজিক সংকটে কীভাবে মানবাত্মা বিপন্ন হয়। সামন্ততন্ত্রের সাথে ধনতন্ত্রের অশুভ আঁতাতের ফলে নিপিড়িত হয় দীন-দরিদ্র মানুষগুলো প্রতিনিয়ত। সেজানের কান্না কিংবা দুমুঠো খাবারের জন্য চালি নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে প্রাণ হাতে করে যাওয়া আবার অরূপরতন বাবু অনেক অনেক ভোগের মধ্যে থেকেও আরো আরো ভোগের গল্প শোনার ইচ্ছা আসলে দুর্বিনীত খিদের অমোঘ গহ্বর মানুষকে নামিয়ে দেয় অতলে। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা ব্যাপক, মানুষের সঙ্গে ব্যাপক মেলামেশা করে লেখক অর্জন

করেছেন মানবজীবনের নানা দুরহ রহস্য কথা। তাই গ্রামীণ জীবন এবং নাগরিক জীবনের নানারূপ এবং মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতা জীবন সরকারের গল্পে অন্তর্মুখী মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। গল্পের মাধ্যমে লেখক বার্তা দিতে চেয়েছেন, সাধারণ মানুষের জীবনকে কিভাবে নির্মল করা যায় এবং কিভাবে শুদ্ধতায় উপনীত করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. দুবে, সি.এস. : 'Indian Village' Isted, New York, Harper Colophon Book, 1967, P-7.

২. ভট্টাচার্য, চিন্ময়ী : 'কথা সাহিত্যে গ্রাম-বাংলা', ১ম সংস্করণ, বর্ধমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ অক্টোবর ১৯৯০।

৩. R.M. Maclver and C.H.Page : "Society" 'Society An Introductory Analysis', reprint London, Mc Millian, 1969, P-5.

৪. রায়, নীহাররঞ্জন : 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩, ৫ম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১২, পৃ. ৭০৬।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'আমি', 'শ্যামলী' রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৩৬, প্রথম রিফ্লেক্ট সংস্করণ- সেপ্টেম্বর-২০০৬, পৃ. ২১৯

৬. সরকার, জীবন : 'ভিনগাঁয়ের রাজ পুত্তুর', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৫।

৭. তদেব : পৃ. ১৫।

৮. তদেব : পৃ. ১৫।

৯. তদেব : পৃ. ১৬।

১০. তদেব : পৃ. ১৫।

১১. তদেব : পৃ. ১৭।

১২. তদেব : পৃ. ২০।

১৩. সরকার, জীবন : ‘গুনিন’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৮০।

১৪. তদেব : পৃ. ১৮১।

১৫. রায়, নীহাররঞ্জন : ‘বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে’জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩, ৫ম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১২, পৃ. ৭০৬।

১৬. সরকার, জীবন : ‘চালি’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ৯৩।

১৭. তদেব : পৃ. ৯৪।

১৮. তদেব : পৃ. ৯৪।

১৯. সরকার, জীবন : ‘কাছিম’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১২৬।

২০. তদেব : পৃ. ১২৮।

২১. তদেব : পৃ. ১২৭।

২২. তদেব : পৃ. ১২৭।

২৩. সরকার, জীবন : ‘অচেনা বৈকালী’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৩৫।

২৪. সরকার, জীবন : ‘শহীদ বলরামপুর’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ২৬।

২৫. তদেব : পৃ. ২৭।

২৬. তদেব : পৃ. ২৭।

২৭. সরকার, জীবন : 'পানি আহিছে', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৬৫।

২৮. সরকার, জীবন : 'হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া', চিকরাশি জীবন সরকারের সংখ্যা, সম্পাদক-অমিত কুমার দে, পৃ. ৩৪।

২৯. তদেব : পৃ. ৩৫।

৩০. ঘোষ, শঙ্খ : 'জ্যৈষ্ঠ', ৬০, Web Link.http://www.kobita.millan sagar.com শঙ্খ ঘোষের কবিতা।

৩১. গুপ্ত, মদন : 'খনার বচন', জ্যোতিষ বচনার্থ, মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১বি, কলেজ রোড কলকাতা-০৯, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫।

৩২. তদেব : পৃ. ৩৫।

৩৩. তদেব : পৃ. ৩৫।

৩৪. তদেব : পৃ. ৩৫।

৩৫. সরকার, জীবন : 'হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া', চিকরাশি জীবন সরকারের সংখ্যা, সম্পাদক-অমিত কুমার দে, পৃ. ৩৫।

৩৬. তদেব : পৃ. ৩৪।

৩৭. তদেব : পৃ. ৩৪।

৩৮. তদেব : পৃ. ৩৪।

৩৯. তদেব : পৃ. ৩৩।

৪০. তদেব : পৃ. ৩৫।

৪১. তদেব : পৃ. ৩৮।

৪২. তদেব : পৃ. ৩৮।

৪৩. তদেব : পৃ. ৩৮

৪৪. তদেব : পৃ. ৩৮।

৪৫. সরকার, জীবন : 'ভালো থেকো', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ.

৪৬. সরকার, জীবন : ‘রোদের জন্য’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ.

৪৭. জসীমুউদ্দীন : ‘বাংলাদেশের একহাজার কবিতা’, সংকলক-আবু কিবরিয়া প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ২০০৮, পৃ. ৭৮

৪৮. আসিম, ইউসুফ : ‘নাগরিক কান্না’, আকাশ-কুসুম, ঢাকা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০০৭, পৃ. ৩২।

৪৯. সরকার, যদুনাথ : ‘History of Bengal’ (Vol-ii), 1948

৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ‘আত্মশক্তি’, রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯০৫, প্রথম রিফ্লেক্ট সংস্করণ-এপ্রিল-২০০৬, পৃ. ৬৫৬

৫১. রায়, অন্নদাশঙ্কর : ‘বাংলার রেনেসাঁস’ পুনর্ভাবনা’, ‘বাংলার রেনেসাঁস’ ১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, কলকাতা, বাণী শিল্প, এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ৬৩।

৫২. সরকার, জীবন : ‘রোদের জন্য’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ৩৬।

৫৩. তদেব : পৃ. ৩৬।

৫৪. তদেব : পৃ. ৩৮।

৫৫. তদেব : পৃ. ৪০।

৫৬. তদেব : পৃ. ৪২।

৫৭. তদেব : পৃ. ৪৩।

৫৮. সরকার, জীবন : ‘ফালতু’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ৮৩।

৫৯. সরকার, জীবন : ‘শেষ স্টেশন’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১০৪।

৬০. তদেব : পৃ. ১০৫।

৬১. তদেব : পৃ. ১০৬।

৬২. সরকার, জীবন : ‘বাস ছাড়লে বৃষ্টি নামে’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৩১।

৬৩. তদেব : পৃ. ১৩২।

৬৪. তদেব : পৃ. ১৩২।

৬৫. তদেব : পৃ. ১৩৪।

৬৬. সরকার, জীবন : ‘নদীর মতন’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ২১।

৬৭. তদেব : পৃ. ২১।

৬৮. তদেব : পৃ. ২৪।

৬৯. সরকার, জীবন : ‘ভিতরে বাইরে ঝড়’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৫৪।

৭০. তদেব : পৃ. ১৫৩।

৭১. তদেব : পৃ. ১৫৩।

৭২. তদেব : পৃ. ১৫৫।

৭৩. তদেব : পৃ. ১৫৬।

৭৪. সরকার, জীবন : ‘আকাশের দিকে’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৮৪।

৭৫. তদেব : পৃ. ১৮৫।

৭৬. তদেব : পৃ. ১৮৫।

৭৭. তদেব : পৃ. ১৮৫।

৭৮. সরকার, জীবন : 'সম্পর্ক', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ২১২।

৭৯. প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত অভয়াচরণ: 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ' ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট শ্রীমায়াপুর।

৮০. চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর : 'মনঃসমীক্ষণের বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য', জে.এন.ঘোষ এণ্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী-২০১১, পৃ.৪৫।

৮১. সরকার, জীবন : 'সেজানের দিনরাত্রি', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১১, পৃ. ১৬৯।

৮২. তদেব : পৃ. ১৭০।

৮৩. তদেব : পৃ. ১৭০।

৮৪. তদেব : পৃ. ১৭২।

৮৫. তদেব : পৃ. ১৭৩।

৮৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'কালের পুত্তুলিকা' দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৪০২, পৃ. ৪৭৩।